গণিত-দর্শন

অভিজিৎ লাহিড়ী

‘দাদা, পালিয়ে আয়, অঙ্ক শেখাচ্ছে.....’

প্রথম পর্ব ।।

এক।।

গটলোব ফ্রেইগে: সাফল্য ও সংশয়।

‘এক সংখ্যাটি [আসলে] কী?’ - অমর নৈয়ায়িক গটলোব ফ্রেইগে (1848-1925) এই বাক্যটি দিয়েই শুরু করেছিলেন তাঁর একটি মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধ । ফ্রেইগে চেয়েছিলেন পাটিগণিত শাস্ত্রকে (arithmetic; এই শব্দটি অনেক সময় ব্যবহৃত হয় ‘প্রকৃত সংখ্যার তত্ত্ব’ বোঝাতে; প্রকৃত সংখ্যা, অর্থাৎ অ-ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা, বা natural number) যুক্তি-শাস্ত্রের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে, এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র গণিতকেই একমাত্র যুক্তিশাস্ত্র সহযোগে গড়ে তুলতে। ফ্রেইগে ভেবেছিলেন, একমাত্র এ ভাবেই সম্ভব, গণিতের এক নিশ্ছিদ্র ও সুনিশ্চিত কাঠামো নির্মাণ, যার ভিতর থাকবে না অনিশ্চয়তার ছিটেফোঁটা, কারণ, যুক্তিবিদ্যা হল আমাদের চিন্তা-ভাবনার সব থেকে মৌলিক উপাদান, তার চাইতে মৌলিক আর কিছু নেই । আর, পাটিগণিতকে যুক্তিশাস্ত্রের মজবুত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হলে প্রথমেই দরকার, পূর্ণ সংখ্যাগুলিকে শুধুমাত্র যুক্তির সাহায্যে সংজ্ঞায়িত করা।

পাটিগণিতকে শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে গড়ে তুলতে গিয়ে ফ্রেইগে একই সঙ্গে গোটা যুক্তিশাস্ত্রকেই দাঁড় করিয়েছিলেন এক অভাবনীয় প্রশস্ত ও মজবুত জমির উপর - বলা চলে, আধুনিক যুক্তিশাস্ত্রের জনক হলেন গটলোব ফ্রেইগে । শুধু যুক্তিশাস্ত্র কেন, ফ্রেইগেকে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের, এবং

দর্শনের বিশ্লেষণী (analytic) ধারার জনক বললেও অত্যুক্তি হয় না, তবে আমাদের এই নিবন্ধে তা খুব প্রাসঙ্গিক নয়। তাঁরই কাটা পথে হেঁটে সেই পথকে আরো প্রশস্ত করেছেন পরবর্তী বহু দিকপাল নৈয়ায়িক ও গাণিতিক, যাঁদের ভিতর ছিলেন জনৈক বার্ট্রান্ড রাসেল (1872-1970), এবং জনৈক কার্ট গোয়েডেল (1906-1978)।

ফ্রেইগে যে কোনো বাক্য বা বিবৃতির বিশুদ্ধ যৌক্তিক উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বিষয়পদ (object) ও বিধেয় বা অভিধা (predicate), এই দুইয়ের মৌলিক স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করেছিলেন, এবং গড়ে তুলেছিলেন অভিধা-আশ্রয়ী যুক্তিশাস্ত্র (predicate logic), যেখানে বিষয়পদের ওপর বিধেয়র প্রযোজ্যতার পারিমাণ-নির্দেশক পদ রূপে স্থান পেল 'সবগুলি' এবং 'কোনো এক', এই দুই পারিমাণিক পদ (quantifier)। এ ছাড়া বাক্যের মৌলিক উপাদান রূপে স্বীকৃতি পেল নেতিকরণ, সংযুক্তিকরণ, ইত্যাদি কয়েকটি যৌক্তিক সংযোজক। এবারে এই কটি মৌলিক উপাদান সহযোগে, এবং আর কয়েকটি যৌক্তিক নীতি (principle) সম্বল করে ফ্রেইগে নির্মাণ করলেন অভিধা-আশ্রয়ী যুক্তিশাস্ত্রের এক বিশাল ও অনন্য স্থাপত্য, যা আশ্রয় দেবে এবং উজ্জীবিত করবে পরবর্তী দিনের বহুসংখ্যক নৈয়ায়িক, গাণিতিক, ও দার্শনিককে।

> অভিধা-আশ্রয়ী যুক্তিশাস্ত্রের গোড়াপত্তন অ্যারিস্টটলের হাতে, এবং তার পর অনেকেরই অবদান ছিল এর প্রথম পর্বে। সাম্প্রতিক পর্যায়ে এর অপর অন্যতম নির্মাতা ছিলেন চার্লস স্যান্ডার্স পীয়র্স (1839-1914)। ফ্রেইগের অভিধা-আশ্রয়ী যুক্তির সঙ্গে আরো আধুনিক যুগের গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রের কিছু বিশেষ পার্থক্য আছে, তবে এখানে তার স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন পড়বে না।

অভিধা-আশ্রয়ী যুক্তিশাস্ত্র ছাড়া যুক্তিশাস্ত্রের অপর প্রকারভেদ হল বিবৃতি-আশ্রয়ী যুক্তি (propositional logic), যেখানে বিবৃতি-বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির পারস্পরিক অন্বয় নিয়ে মাথা ঘামানোর ব্যাপার নেই, গোটা বিবৃতিই যেখানে মৌলিক একক, এবং বিবৃতিগুলি যেখানে আবার যৌক্তিক সংযোজক সহযোগে জটিলতর বিবৃতির উপাদানের কাজ করে ('*জল তরল*', '*প্রস্তর কঠিন*', আর '*জল তরল এবং প্রস্তর কঠিন*', এগুলি সবই এক একটি বিবৃতি, যেখানে 'তরল' পদটিকে 'জল'-এর অভিধা রূপে, বা 'কঠিন' পদটিকে 'প্রস্তর'-এর অভিধা রূপে দেখা হচ্ছে না; অভিধা-আশ্রয়ী যুক্তিশাস্ত্রে কিন্তু বাক্যগুলির অভ্যন্তরীণ অন্বয় স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা দাবী করে, এবং

সে ক্ষেত্রে ‘সব প্রস্তরই কঠিন’, এই ধরনের পারিমাণিক বাক্যও সম্ভব; বিবৃতি-আশ্রয়ী যুক্তিশাস্ত্রে এই বাক্যটির অন্তর্গত পদগুলির কোনো স্বতন্ত্র তাৎপর্য নেই)। স্পষ্টতই, বিবৃতির অভ্যন্তরীণ অন্বয় বিচার করলে সে বিচার-শাস্ত্র হয়ে ওঠে অনেক সমৃদ্ধ, আর তাই, অভিধা-আশ্রয়ী যুক্তি সম্বল করে ফ্রেইগে নেমে পড়েছিলেন সেই বিশাল দায়িত্ব পালনে - প্রথমে পাটিগণিতকে আর তার পর ক্রমশ সমগ্র গণিতকে বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে গড়ে তুলতে । এরই প্রথম ধাপ হিসেবে তিনি চেয়েছিলেন পূর্ণ সংখ্যাগুলির শুদ্ধ যৌক্তিক সংজ্ঞা দিতে।

ফ্রেইগের যুক্তিশাস্ত্রের অপর বিশেষত্ব ছিল, চলক পদ (variable term) এবং অপেক্ষক (function)-এর ব্যবহার ও প্রয়োগ। বস্তুত, অপেক্ষকগুলিই ছিল অভিধার গাণিতিক রূপ। সংযোজক, চলকপদ, অপেক্ষক, আর পারিমাণিক পদ, এগুলি মিলে যৌক্তিক বাক্যগুলিকে দিয়েছিল এক অতি প্রশস্ত ও বহুমুখী প্রকাশক্ষমতা ।

ফ্রেইগে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন *ধারণা* (concept) ব্যাপারটির ওপর। যেমন, ‘এই ঘরে উপস্থিত ব্যক্তি’ - এটি একটি ধারণা । প্রতিটি ধারণারই একটি বিস্তারক্ষেত্র, বা সংক্ষেপে শুধু ‘বিস্তার’ (extension) থাকবে (‘ধারণা’ আর তার বিস্তারক্ষেত্র ফ্রেইগের যুক্তিশাস্ত্রের দুটি শব্দার্থগত মৌলিক উপাদান)। যেমন, ওপরের দৃষ্টান্তে ধারণাটির বিস্তারক্ষেত্র হল, ঘরে উপস্থিত ব্যক্তিদের সমাহার (set)। তবে ফ্রেইগে কিন্তু বিস্তার আর সমাহার, এ দুটি এক না আলাদা, তা নিয়ে বেশি ভাবেন নি, তিনি কেবল ‘বিস্তার’ কথাটিই ব্যবহার করেছেন, সেটির সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা কী হতে পারে, তার চুলচেরা বিচার বা মীমাংসায় যান নি। এ প্রসঙ্গে পরে আমাদের মনোযোগ দেওয়ার দরকার পড়বে, কারণ এটি একটি গুরুতর বিষয়।

গণিতের বহুবিধ চর্চায় আর এর মূলতত্ত্বের (foundations) আলোচনায় ‘সমাহার’ বা set-এর গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনো সংখ্যক বস্তু বা বিষয়কে একযোগে বলা হয় একটি সমাহার, আর এর অন্তর্ভুক্ত বস্তু বা বিষয়গুলি হল সমাহারের ‘সদস্য’ বা element । যেমন, ছাতা, লাঠি, চশমা, এই তিনটি মিলে হল একটি সমাহার, আর ঐ বস্তুগুলির প্রতিটি হল সেই সমাহারের সদস্য । সমাহার বোঝাতে সাধারণত {...} চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। সমাহারের সদস্যগুলি যে সব একই ধরনের হতে হবে তার কোনো মানে নেই । যেমন, {ছাতা, লাঠি, চশমা, নায়াগ্রা জলপ্রপাত}, এটিও একটি সমাহার। বিশ্বজগতের সকল

বস্তু ও বিষয়কে একটি সামান্যীকৃত রূপে দেখার উপায় হল সমাহার। জগতের সকল বস্তু বা বিষয়ের ভিতর কোনগুলি 'একই ধরনের', আর কোনগুলি নয়, তার মীমাংসা দুরূহ।

তাঁর উপরোক্ত স্ব-আরোপিত প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত নিজের মত করে সমাধা করতে পেরেছিলেন ফ্রেইগে। কিন্তু তার পর দেখা গেল, ফ্রেইগের তৈরী যৌক্তিক কাঠামোটি নিশ্ছিদ্র নয়, একটি ছোট্ট চিড় রয়ে গেছে তার ভিতর। বার্ট্রান্ড রাসেল ফ্রেইগেকে লেখা একটি চিঠিতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই 'ছোট' ত্রুটিটির, কিন্তু ছোট হলে কি হবে, ফ্রেইগে ত চেয়েছিলেন একটি নিরেট নিশ্ছিদ্র যৌক্তিক কাঠামো তৈরী করতে, গণিতকে বিশুদ্ধ যৌক্তিক উপাদান সহযোগে গড়ে তুলতে। এই ছিদ্র দিয়েই ত বিষধর সাপের রূপ ধরে ঢুকে পড়তে পারে 'শণি' (অর্থাৎ অযৌক্তিক, ভুল চিন্তা), তাই ফ্রেইগে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তাঁর নিজের কালজয়ী সৃষ্টির উপর।

নৈয়ায়িক, গাণিতিক ও দার্শনিক হিসেবে ফ্রেইগের জীবন খুব মসৃণ ছিল না। অর্থকষ্ট ছাড়াও বহু মানসিক যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে। তারঁ কাজের স্বীকৃতি তিনি জীবদ্দশায় বড় একটা পান নি। রাসেল (আর, কিছুটা, ভিটগেনস্টাইন (1889-1951)) স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাঁর কাজকে। আর, মৃত্যুর পর উত্তরোত্তর বিপুল স্বীকৃতি পেতে থাকল ফ্রেইগের যৌক্তিক ও দার্শনিক অবদান।

প্রকৃত সংখ্যাগুলি আসলে কী তা বোঝার জন্য, দুটি ধারণা কখন 'সমসংখ্যাবিশিষ্ট' (equinumerous), সেই অভিধাটি সংজ্ঞায়িত করলেন ফ্রেইগে, এবং এ কাজে তিনি সাহায্য নিলেন 'হিউমের নীতি' নামক একটি সূত্রের, যেটিকে তিনি তাঁর নিজের মত করে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর যুক্তিশাস্ত্রের একটি বিশেষ যৌক্তিক স্বীকৃতি রূপে (তিনি এটির নাম দিয়েছিলেন 'পঞ্চম মূল নীতি', বা basic law V)। রাসেল একটি কূটবাক্য গঠন করে দেখালেন যে এখানেই তৈরী হচ্ছে এক সমস্যা, যা ফ্রেইগের প্রকল্পের ওপর বিস্তার করছে সংশয়ের ছায়া। রাসেলের কূটবাক্যটির একটি সজবোধ্য রূপ 'মিথ্যাভাষণের কূট' নামে খ্যাত: '*অমুক শহরের সকলেই মিথ্যাবাদী*' - এখানে বক্তা নিজেই যদি সেই শহরের লোক হন তখনই এসে পড়ে জটিল বিভ্রাট। কূটবাক্যটি আত্ম-উল্লেখ (self-reference) দোষে দুষ্ট, আর এর ভিতর ঐ 'সকল' কথাটি খুব বিপজ্জনক। এটি অভিধা-বিপর্যয়ী (impredicative) সংজ্ঞার একটি নিদর্শন।

আসলে, কোনো আলোচনা বা চর্চায় যে সব বস্তু বা বিষয় নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, তার সবগুলিকে একযোগে যদি একটি *ভুবন* (universe) বলে ভাবা যায়, তবে ঐ আলোচনায় কিন্তু সমগ্র ভুবনটি নিয়ে কিছু বলা একটু বে-আইনী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শুদ্ধ যুক্তির বিচারে, ঐ সব বস্তু বা বিষয় নিয়ে আলোচনার যে 'ভাষা', তার ভিতর সমগ্র ভুবন নিয়ে আলোচনার জায়গা থাকার কথা নয় - তার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটি ঊর্ধ-ভাষা বা metalanguage-এর । বাংলা, ইংরেজী, এই সব প্রকৃত ভাষা বা natural language নিজেরাই নিজেদের ঊর্ধ-ভাষার কাজ করে। এটাই এই ভাষাগুলির জোরের জায়গা, কিন্তু এর ফলে এদের ভিতর থাকে নানান অনির্দিষ্টতা, আর থাকে স্ব-বিরোধের উপাদান, যা গাণিতিক ও যৌক্তিক আলোচনার জন্য উপযুক্ত নয়। এর জন্য দরকার যৌক্তিক ভাষা, যার সংজ্ঞা দেয় ফ্রেইগের যৌক্তিক তন্ত্র । কিন্তু এ ক্ষেত্রে খুব সাবধান থাকা দরকার, অভিধা-বিপর্যয় যেন না ঘটে - ভাষা আর ঊর্ধ-ভাষার স্বাতন্ত্র্য যেন লঙ্ঘিত না হয় । এটিই হল ভাষাতত্ত্ব, দর্শন আর গণিতের সমস্ত জটিলতার এক অন্যতম মৌলিক উৎসবিন্দু ।

ফ্রেইগে তাঁর ন্যায়শাস্ত্রকে প্রথম বর্গের যুক্তির (first order logic) ভিতর সীমাবদ্ধ রাখেন নি । শুধু বিষয় আর অভিধা, এই নিয়ে যে চর্চা, সেটিই হল প্রথম বর্গের যুক্তি । আর, অভিধাগুলিকেই যদি বিষয় রূপে দেখা হয়, তখন আবার তাদের অভিধার কথাও ভাবা যেতে পারে। যেমন, ফুল যখন বিষয়, তখন 'লাল' তার অভিধা । আবার 'লাল'-কে বিষয় ধরে 'গাঢ়' লাল-এর কথাও ভাবতে আপত্তি নেই - এটি একটি দ্বিতীয় বর্গের অভিধা । ফ্রেইগের যৌক্তিক তন্ত্রের অন্তর্গত পারিমাণিক পদগুলি আসলে এ রকম দ্বিতীয় বর্গের অভিধা । আর, 'সমসংখ্যাবিশিষ্ট' এই অভিধার সাহায্য নিয়ে ফ্রেইগে যখন পৌঁছলেন প্রকৃত সংখ্যার ধারণায়, তখন সেটিরও ভিত্তি হল ঐ দ্বিতীয় বর্গের অভিধা ।

প্রকৃত সংখ্যা বিষয়ে ফ্রেইগের চিন্তা-ভাবনার বিশদ বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য, সূত্র [GV], দ্বিতীয় অধ্যায়।

মাষ্টারমশাই যখন খুব সূক্ষ্ম কায়দায় ছাত্রকে অঙ্ক শেখাতে চাইছেন, আর ছোট ভাই যখন দাদাকে বলছে মাষ্টারমশায়ের সংস্রব ত্যাগ করে পালিয়ে আসতে, তখন তার ভিতরকার 'যুক্তি' খুব সরল - সে চায় তার

ভালমানুষ দাদাটিকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে। আর, মাষ্টারমশাইকেও ত কখনো মাথা ঘামাতে হয় নি, এক সংখ্যাটি 'আসলে' কী তাই নিয়ে - অথচ তবু ত তিনি দিব্যি অক্লেশে ছাত্রদের অঙ্ক শিখিয়ে চলেছেন। জীবনের চলার পথে যেটুকু অঙ্ক দরকার তা জীবন ও পারিপার্শ্বিক থেকেই শিখে নেওয়া যায় - যে ছোট ছেলেটি বাবার দোকানে বসে তেল-নুন বিক্রী করছে, তাকে মাষ্টারমশায়ের কাছ থেকে যোগ-বিয়োগ শিখে নিতে হয় নি। তা হলে এইসব প্রথম বর্গ, দ্বিতীয় বর্গ, অপেক্ষক, সংযোজক, এ সবের কি সত্যিই দরকার আছে? গণিত-দর্শনের এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। ফ্রেইগে চেয়েছিলেন গণিতের মূলতত্ত্বকে বিশুদ্ধ যুক্তির কাঠামোয় দাঁড় করাতে। যুক্তি অবশ্য মানুষের চিন্তাপদ্ধতিরই এক চূড়ান্ত পর্যায়ের সামান্যীকৃত ও বিমূর্ত নির্যাস। কিন্তু দৈনন্দিন চিন্তা-ভাবনার জগৎ থেকে একবার যুক্তির জগতে ঢুকে পড়লে তার পর আর দৈনন্দিন চিন্তার সাহায্য না নিয়ে কি ভাবে গণিতের মূলতত্ত্বে পৌঁছন যায়, সেটিই ছিল ফ্রেইগের উদ্দেশ্য। কেবল দৈনন্দিন চিন্তার জগতে আবদ্ধ থেকে গণিতে বেশি দূর এগুনো যায় না। গণিতের দর্শনে এই প্রসঙ্গটি নানাভাবে ফিরে ফিরে আসে। উচ্চতর গণিত কি বাস্তব জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন? এর উত্তর কিন্তু মোটেই খুব সরল নয়।

গণিতের মূলতত্ত্বে সব চাইতে বিতর্কিত বিষয় হল অণুসম (infinitesimal), এবং অসীম বা অনন্ত (infinite) সম্পর্কিত ধারণা।

দুই ।।

অণুসম ও অনন্ত।

গণিতের মূলতত্ত্বে অসীম বা অনন্ত সম্পর্কিত জটিলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল গিয়র্গ কান্টরের (1845-1918) যুগান্তকারী অবদানের সূত্র ধরে।

তবে তারও আগে, অণুসম রাশি নিয়ে হয়রান হতে হয়েছে গাণিতিকদের। অণুসম হল এমন এক রাশি যা শূন্য নয়, অথচ শূন্যের এত কাছাকাছি যে তাকে কোন সংখ্যামান দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এই উদ্ভট বস্তুটিকেই অবলম্বন করে নিউটন সহ কয়েক প্রজন্মের গাণিতিক মহারথীরা অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের চর্চায়। 'গণিত-চর্চায় যা এত দরকারী ও কার্যকর, তা নিশ্চই ভুল কিছু নয়' এই ছিল অণুসম সম্পর্কে গাণিতিকদের

মনোভাব, কারণ অণুসমকে ঠিকমত না বুঝেও গাণিতিক গণনায় কিভাবে তাকে ব্যবহার করতে হবে সে ব্যাপারে কোনো বিভ্রান্তি ছিল না তাঁদের । তাই অণুসম বস্তুটি 'আসলে' কী তা নিয়ে খুব একটা তলিয়ে ভাবেন নি তাঁরা, তবে সকলেই চাইছিলেন ব্যাপারটার একটা সন্তোষজনক ফয়সলা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অগাস্টিন-লুই কোশী (1789-1857) ও তাঁর সমসাময়িক গাণিতিকরা অণুসম রাশিকে বেঁধে দিলেন একটা পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক ব্যাখ্যার বাঁধনে, যেখানে প্রধান অবলম্বন হল সীমামান বা limit-এর ধারণাটি। গোটা উনিশ শতক জুড়ে সীমামান, অণুসম রাশি, অবিচ্ছিন্নতা (continuity), এইসব গাণিতিক বিষয়গুলির বিদগ্ধ ধারণা অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল বৈশ্লেষিক গণিতের (mathematical analysis) এক বিশাল ও অনন্যসাধারণ কাঠামো, যার দুই অন্যতম স্থপতি ছিলেন কোশী আর কার্ল ভায়ারস্ট্রাস (1815-1897)। তবে অণুসম রাশির ভূত কিন্তু রয়েই গেল অনন্ত বা অসীমের ধারণার হাত ধরে। সরল সংখ্যাগুলির (real numbers) সমাহার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে গাণিতিকেরা টের পেলেন তা।

সরল সংখ্যাগুলিকে একটি সরলরেখা বা সরল অক্ষের ওপর এক একটি বিন্দুর সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে। এই রেখার ওপর যে কোন একটি মুলবিন্দু O-কে যদি শূন্য সংখ্যার নির্দেশক বলে ভাবা হয়, তবে তার ডান দিকের বিন্দুগুলির সাহায্যে অন্য সব ধনাত্মক সংখ্যা আর বাঁ দিকের বিন্দুগুলির সাহয্যে ঋণাত্মক সংখ্যা নির্দেশ করা যেতে পারে। এদেরই ভিতর কিছু কিছু বিন্দু ধণাত্মক ও ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা নির্দেশ করে (ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাগুলিকে 'প্রকৃত সংখ্যা' নাম দেওয়া হয়; শূন্যকেও প্রকৃত সংখ্যা ধরা যেতে পারে; আমরা আপাতত ঋণাত্মক সংখ্যার কথা ভাবব না)। প্রকৃত সংখ্যা নির্দেশক বিন্দুগুলি সরল অক্ষের ওপর ছাড়া ছাড়া ভাবে বিন্যস্ত, পরপর দুটি প্রকৃত সংখ্যার ভিতর নির্দিষ্ট ফাঁক রয়েছে, কিন্তু এদের ভিতর রয়েছে আরো অসংখ্য সরল সংখ্যা । সরল সংখ্যাগুলির ভিতর আবার শ্রেণীবিভাগ রয়েছে - ভগ্ন-সংখ্যা বা মূলদ রাশি (rational numbers; 1/2, 3/5, ইত্যাদি), অমূলদ বীজ-রাশি (irrational algebraic numbers; যেমন, $\sqrt{2}$) বীজোত্তর রাশি *(transcendental numbers;* যেমন, π, অর্থাৎ 'পাই' সংখ্যাটি*)* । সরল অক্ষের ওপর অবস্থিত যে কোন দুটি বিন্দুর ভিতর অসংখ্য মূলদ রাশি বা অমূলদ বীজ-রাশি নির্দেশক বিন্দু বসানো যায়, অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর রাশিগুলি সরল অক্ষের উপর ঘন-নিবদ্ধ (dense), কিন্তু তবু তারা অবিচ্ছিন্ন নয়। সব ধরনের রাশি মিলিয়ে সরল সংখ্যার সমাহারটি যে সব বিন্দু সহযোগে নির্দেশিত হয় তারাই বস্তুত একযোগে সরল অক্ষটি রচনা করে। শুধু বীজ-রাশি বা শুধু বীজোত্তর রাশিগুলি নিলে কিন্তু সরল অক্ষের গঠন পুরো হয় না।

সরল অক্ষের ওপর কোন একটি সরল সংখ্যা নির্দেশক বিন্দুর খুব কাছেও যদি অপর একটি বিন্দু নেওয়া যায় তবু আবার তার চাইতেও কাছে আরো অসংখ্য বিন্দু পাওয়া সম্ভব। এটিই বস্তুত অণুসম রাশির ইঙ্গিত বহন করে। আবার, এই যে দুটি সরল রাশির ভিতর আরো অসংখ্য সরল রাশির ('সরল রাশি' বলতে আমি 'সরল সংখ্যা'ই বোঝাচ্ছি) অস্তিত্ব - এটি সরল রাশিগুলির মোট সংখ্যার অনন্ততার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

তিন।।

অনন্তের জরিপ।

আচ্ছা, দুটি অনন্তের ভিতর কি তুলনা করা সম্ভব? প্রকৃত সংখ্যাগুলির যে সমাহার, তার সদস্যপদের সংখ্যা অসীম, অর্থাৎ, প্রকৃত সংখ্যার কোন শেষ নেই, আবার সরল সংখ্যাগুলির সমাহারও অনন্ত। কিন্তু দুইয়ের ভিতর প্রভেদ অস্বীকার করা চলে না। প্রকৃত সংখ্যাগুলিকে পরপর সাজিয়ে এক, দুই, করে গোনা যায় (অর্থাৎ প্রকৃত সংখ্যার সমাহারটি 'গণনা-যোগ্য' বা countable; এখানে 'গণনযোগ্য' শব্দটি উপযোগী নয়, কারণ সেটি computable শব্দের পরিভাষা), যদিও সে গোনার কোন শেষ নেই, আর সরল সংখ্যাকে গোনাই যায় না ('অ-গণনাযোগ্য' বা uncountable)। বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা নিয়ে গাণিতিক চিন্তা-ভাবনার একটি পর্যায় শুরু হয় রিচার্ড ডেডিকিন্ড (1831-1916) ও গিয়র্গ কান্টরের গাণিতিক অবদানের পথ ধরে। কান্টর দেখালেন, প্রকৃত সংখ্যাগুলির তুলনায় সরল সংখ্যার সমাহারের 'বিস্তৃতি' বেশী - দুই অনন্তের ভিতর প্রকৃত সংখ্যার অনন্ত মাপে ছোট। কোন সমাহারের বিস্তৃতি বোঝাতে কান্টর তার 'বিস্তৃতিমান'-এর (cardinality) ধারণাটি সৃষ্টি করলেন।

দুটি সমাহারের সদস্যগুলিকে এক এক করে নিয়ে যদি জোড় বাঁধা যায়, তবে শেষ পর্যন্ত যেটির সদস্য অতিরিক্ত পড়ে থাকে, সেটিরই বিস্তৃতিমান বেশি - সসীম সমাহারের বেলায় এই ধারণাটি প্রশ্নাতীত। কান্টর এটিকেই প্রয়োগ করলেন অনন্তবিস্তৃত সমাহারগুলির তুলনার মাপকাঠি হিসেবে।

জোড় বাঁধার পর দুটি সমাহারর ভিতর কোনটিরই কোন সদস্য যদি অতিরিক্ত পড়ে না থাকে, তবে তাদের বিস্তৃতিমান সমান। এটিই, বস্তুত, 'হিউমের নীতি'। এই অনুযায়ী, একটি আশ্চর্যজনক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে - প্রকৃত সংখ্যা আর মূলদ সংখ্যাগুলির সমাহারের বিস্তৃতিমান অনন্ত, কিন্তু *সমান*। এটি আশ্চর্যজনক এই কারণে যে, প্রকৃত সংখ্যাগুলি সরল অক্ষের উপর ছাড়া ছাড়া ভাবে বিন্যস্ত, কিন্তু মূলদ সংখ্যাগুলি ঘন-নিবদ্ধ। তবু তাদের সমাহারের বিস্তৃতিমান সমান। এবং, এদের তুলনায় সরল সংখ্যাগুলির সমাহার আরো বেশি বিস্তৃত। এখান থেকেই শুরু হয় গণিতের নানান বিচিত্র ও আশ্চর্য সব সিদ্ধান্তের মিছিল। কান্টরই সমাহার-তত্ত্বকে একটা সুসংবদ্ধ রূপ দেন, যদিও পরবর্তী পর্যায়ের তুলনায় সেটির বৈদগ্ধ্য ছিল কিছু কম। কান্টর অবতারণা করলেন এক অতি গভীর প্রশ্নের: প্রকৃত সংখ্যার সমাহারের যে বিস্তৃতিমান, আর সরল সংখ্যার সমাহারের বিস্তৃতিমান, এই দুইয়ের মাঝামাঝি কোন বিস্তৃতিমান কি সম্ভব? কান্টর বিশ্বাস করতেন, সম্ভব। কিন্তু তত্ত্ব অনুযায়ী কোন মাঝামাঝি বিস্তৃতিমানের হদিশ পাওয়া গেল না। মাঝামাঝি আর কোন বিস্তৃতিমানের অস্তিত্ব নেই, এটিই ক্রমশ একটি অনুমান রূপে স্বীকৃত হল - অবিচ্ছিন্নতার অনুমান (continuum hypothesis)।

চার ।।

ফ্রেইগে ও রাসেল: নৈয়ায়িকতা।

ফ্রেইগে ও রাসেল, এঁরা দুজনে গণিত-দর্শনে নৈয়ায়িকতা বা logicism-এর ধারার দুই পুরোধা। ফ্রেইগে চেয়েছিলেন প্রথমে পাটিগণিতকে ও তার পর সমগ্র গণিতকেই যুক্তিশাস্ত্রের কাঠামোয় দাঁড় করাতে (অবশ্য জ্যামিতিকে তিনি বাদ রেখেছিলেন তাঁর প্রকল্প থেকে)। ফ্রেইগে যুক্তিশাস্ত্রকেই গণিতের ভিত্তি করতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন ইমানুয়েল কান্টের (1724-1804) গণিত-দর্শনের বিরোধী।

> কান্ট গণিতের বিবৃতি বা সত্যগুলিকে স্বতঃপ্রতীত (a priori) অথচ *সংশ্লেষী* (synthetic) বলে চিহ্নিত করেছিলেন (সূত্র [Sh] দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), এবং এই নিয়ে দার্শনিকদের ভিতর বিশাল আলোচনা-সমালোচনার বন্যা বয়ে গিয়েছিল। কান্টের মতে এগুলি স্বতঃপ্রতীত এই কারণে যে এগুলির যাথার্থ্য

নিরূপনে বহির্জগত থেকে পাওয়া তথ্য বা অনুভূতির কোন প্রয়োজন পড়ে না। আর, সংশ্লেষী এই কারণে যে এগুলির সত্যতা শুধুমাত্র সংজ্ঞা-আশ্রয়ী নয় - অর্থাৎ, এগুলিতে ব্যবহৃত পদগুলির সংজ্ঞা থেকেই এদের সত্যতার হদিশ পাওয়া যায়, এমন নয় ('সব শিক্ষকই শিক্ষা দেন', এই বিবৃতিটির সত্যতা 'শিক্ষক' পদের সংজ্ঞা থেকেই জানা যায়, তাই এটি সংশ্লেষী নয়, বৈশ্লেষিক বা analytic)। গণিতের বিবৃতিগুলি যদি স্বতঃপ্রতীত অথচ সংশ্লেষী চরিত্রের হয় তবে তাদের ভিতর সংজ্ঞার অতীত সত্যতা গুণের উদ্ভব হয় কি ভাবে? কান্ট এখানে তাঁর প্রসিদ্ধ আদি-বোধ বা intuition-এর ধারণাটি হাজির করেন। আমরা এমন এক প্রস্থ সহজাত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী যার জোরে আমরা গাণিতিক সত্যের সন্ধান পাই। গাণিতিক সত্য হল সেই আধার যা অন্যবিধ বস্তুগত বা জাগতিক সত্যকে আধেয় রূপে ধারণ করে নির্দিষ্টতা দেয়। বস্তুত, জগৎ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় জ্ঞানই উদ্ভাসিত হয় ঐ আদি-বোধের আলোকে।

ফ্রেইগের প্রখর যুক্তিবাদ কিন্তু রাজি হল না কান্টের প্রায়-অলৌকিক আদি-বোধকে স্বীকৃতি দিতে। ফ্রেইগে প্রমাণ করতে চাইলেন, গণিত আসলে স্বতঃপ্রতীত এবং *বৈশ্লেষিক* (সূত্র [Sh] পঞ্চম অধ্যায়)- গণিতের সত্য সবই যুক্তি-পরম্পরা সঞ্জাত, এখানে বহির্জগতের কোন ব্যাপার নেই - অবশ্য একেবারে যে নেই তা নয়। যৌক্তিক স্বতঃসিদ্ধগুলি এবং উপপাদনের নিয়ম - এগুলি মানুষের চিন্তাবৃত্তির এক বিমূর্ত ও সামান্যীকৃত সূত্রায়ন - তবে, শুধু এগুলি থেকেই গাণিতিক উপপাদ্যগুলিতে পৌঁছন যায় বলে গণিত সংশ্লেষী নয়, বৈশ্লেষিক।

অবশ্য, হয় বৈশ্লেষিক আর না হয় ত সংশ্লেষী, এই ধরনের মেরুকরনের তাৎপর্য সীমিত কেবল একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর ভিতরই - এই মেরুকরনের অতীত দৃষ্টিকোণও সম্ভব। যেমন ধরা যাক, কিছু প্রারম্ভিক স্বীকৃতি থেকে শুরু করে এবং এক প্রস্থ উপপাদনের নিয়ম প্রয়োগ করে কোন গাণিতিক এক দুরূহ উপপাদন প্রক্রিয়ায় কোন এক গাণিতিক বিবৃতি প্রতিষ্ঠা করলেন। এক দিক দিয়ে দেখলে, তাঁর প্রয়াসের ভিতর 'নতুন' কিছুই নেই, কারণ তাঁর প্রমাণের সবটাই নিহিত ছিল ঐ স্বীকৃতিগুলির ভিতর ও ওই নিয়মগুলির ভিতর - এগুলি 'আগে থেকেই' ছিল, অভীষ্ট বিবৃতিটিতে পৌঁছে তিনি নতুন কিছুই দিতে পারলেন না জগৎকে। আবার, অন্যভাবে দেখলে, চূড়ান্ত বিবৃতিটি আমাদের *ধারণার* জগতে এক নতুন ও অভিনব সংযোজন, এটি আগে ছিল না - গাণিতিক তাঁর উদ্ভাবনী-ক্ষমতা প্রয়োগ করে এটি উপহার দিলেন আমাদেরকে। আমরা ক্রমশ দেখব, আপাত-দৃষ্টিতে বিরোধী দুটি বক্তব্যের ভিতর ব্যবধান অনেক সময়ই নির্ভর করে দৃষ্টিকোণের উপর, কোন প্রসঙ্গে বক্তব্যটি রাখা হচ্ছে, তার উপর - অনেক সময়ই আমরা কোন বক্তব্যকে তার নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ-নির্ভর তাৎপর্যের বাইরে আরো বিমূর্ত কোন তাৎপর্যে মন্ডিত করতে চাই, আর তখনই ঘটে বিভ্রাট।

আগেই বলেছি, ফ্রেইগে কিন্তু পাটিগণিতের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলেন, যদিও তবু তিনি রাসেলের কূট থেকে বেরোতে পারেন নি, এবং তাই আর এগোনরই চেষ্টা করেন নি। ফ্রেইগের প্রকল্প রূপায়নে সমস্যা ঠিক কোথায় ছিল তা নিয়ে গাণিতিক ও নৈয়ায়িকরা আলোচনা করেছেন । একটা সমস্যা ছিল, কোন ধারণার বিস্তারক্ষেত্র (বা সংক্ষেপে শুধু 'বিস্তার') বিষয়টিকে ঘিরে । যদি প্রশ্ন করা যায়, 'বিস্তারক্ষেত্র' ধারণাটির বিস্তার কী হবে ? অর্থাৎ, সব রকম ধারণার বিস্তারক্ষেত্র মিলে যে ভুবন, সেটি আসলে কী? সে ভুবনকে যদি আর পাঁচটি বিস্তারক্ষেত্রের মতই আর একটি ক্ষেত্র বলে ধরা হয়, তখনই দেখা দেয় কূটের সমস্যা, কারণ সেই সমগ্র ভুবনটিকে নিয়ে কিছু বলতে গেলেই আত্ম-উল্লেখ দোষ এসে পড়ে। তাই, ফ্রেইগে যেখানে চেয়েছিলেন মানুষের চিন্তাবৃত্তির এক চূড়ান্ত পর্যায়ের সামান্যীকরন, বিস্তারক্ষেত্রের বিষয়টিতে এসে সেই পর্যায়ের সামান্যীকরন বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি । বিস্তারক্ষেত্রের সমগ্র ভুবনটি আসলে কী, তার জন্য শুদ্ধ যৌক্তিক কাঠামোর বাইরে এসে মীমাংসা খুঁজতে হবে। ফ্রেইগে তা চান নি। তার পর, ধরা যাক, হিউমের নীতি - এটিও ত বাস্তব জগতের জমি থেকে পাওয়া - সংখ্যা-গণনে আমরা সচেতন ভাবে হোক বা না হোক, এটিকে সর্বদাই প্রয়োগ করি, তবে সব সময়েই তা করি সসীম সমাহারের বেলায় - অনন্ত সমাহারের বেলায় যে এটি অভ্রান্ত তারই বা নিশ্চয়তা কি । বস্তুত, অনন্তবিস্তৃত সমাহারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়েই ত এসে পড়ল রাসেলের কূট। আগেই বলেছি, ফ্রেইগে 'বিস্তারক্ষেত্র' বিষয়টিকে খুব খুঁটিয়ে বিচার করেন নি - সকল বিস্তারক্ষেত্রের গোটা ভুবন নিয়ে কিছু বলা যে বিপজ্জনক, তা যখন তিনি বুঝলেন, তখন হতোদ্যম হয়ে পড়লেন তিনি। যদিও প্রকৃত সংখ্যাগুলিকে যুক্তিশাস্ত্রের আধারে সংজ্ঞায়িত করার ব্যাপারে তাঁর সমাধানটি ঠিকই ছিল, এবং পরবর্তী সময়ে তাঁরই দেখানো পথে গাণিতিকরা সে সংজ্ঞা দিয়েছেন।

> মনুষ্যজাতি বহু দিন আগেই এক, দুই, ইত্যাদি সংখ্যা গোনার 'গণিত' রপ্ত করেছে । একটি শিশুও বেড়ে ওঠার পথে বড়দের অল্প প্রশিক্ষণেই সে গণিত শিখে ফেলে। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদেরও সম্ভবত সংখ্যার খুব প্রথমিক ধারণা আছে, কারণ সংখ্যার ধারণাটি প্রতিকূল পরিবেশে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে এক বিশাল সদর্থক ভূমিকা পালন করে । অথচ আমাকে যদি এখন বলা হয় প্রকৃত সংখ্যাগুলির একটা নিশ্ছিদ্র সংজ্ঞা দিতে, আমি ঠিকমত পারব না, বড়জোর দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাব, এটা এক, এটা দুই, ইত্যাদি। বস্তুত আমরা জীবনে বহু কিছুই শিখি দৃষ্টান্তের মাধমে, অথচ আমাদের অনুমান-ক্ষমতা তা

থেকে ঠিকমত নির্যাস বার করে নেয়। এই অনুমানক্ষমতা নিয়ে যুগে যুগে দার্শনিকরা নানা তত্ত্ব হাজির করেছেন, যার ভিতর, স্বাভাবিকভাবেই, রয়ে গেছে অলৌকিকের ছোঁয়া। কান্টের আদি-বোধও এরই রকমফের। অথচ জৈব বিবর্তনের পথে উদ্ভূত মানুষের যে বোধ-ক্ষমতা (cognitive ability) তার ভিতরই ওতপ্রোত রয়েছে বিমূর্তকরন (abstraction) ও সামান্যীকরনের (generalization) (এ দুটিই হল দৃষ্টান্ত থেকে নির্যাস নিষ্কাশনের প্রকৃষ্ট প্রক্রিয়া - আমাদের অনুমান-বৃত্তির এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য) সহজাত দক্ষতা। আমরা যেটা সহজাত বোধে শিখি অথচ নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করতে পারি না, তারই নিশ্ছিদ্র যৌক্তিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছে ফ্রেইগে, রাসেল ও অন্য গাণিতিকদের। তবু শেষ পর্যন্ত এমন কিছু ধারণা ও স্বীকৃতির সাহায্য নিতে হয়েছে যা 'বাইরের' জগৎ থেকে পাওয়া - অবশ্য এগুলিকেও যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে ছেঁকে নিয়ে তার পর বিবৃত করেছেন তাঁরা। এ নিয়ে আমরা পরে আরো কিছু চর্চা করব।

ফ্রেইগের হাত থেকে নৈয়ায়িকতার মশালটি ধরে নেন বার্ট্রান্ড রাসেল (মূলত রাসেলই গাণিতিকদেরকে পরিচিত করেছিলেন ফ্রেইগের অবদানের সঙ্গে)। রাসেল ও অন্যান্য নৈয়ায়িকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, এমন এক যুক্তিপরম্পরায় গণিতকে সংজ্ঞায়িত করা যা থেকে আর কোন কূট বা স্ববিরোধের উদ্ভব হবে না। কিন্তু দেখা গেল, 'স্ববিরোধের উদ্ভব হবে না' এ কথা জোর দিয়ে বলা অত সহজ নয়। কোন এক যৌক্তিক তন্ত্রে কোন স্ববিরোধ দেখা যাচ্ছে না, এ পর্যন্ত বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু এ থেকে যত রকমের সিদ্ধান্ত সম্ভব সে সব যদি একে একে উপপাদন করা যায় তবে কোনদিন কোন স্ববিরোধ দেখা দেবে না, এ কথা বলার ছাড়পত্র দেয় না যুক্তিশাস্ত্র। তবে হ্যাঁ, রাসেলের কূট বা অন্য নির্দিষ্ট কোন কূটের উদ্ভব হবে না, এই সঙ্কল্প মাথায় নিয়ে তৈরী করা যেতেই পারে যৌক্তিক তন্ত্র - রাসেল ও তাঁর সতীর্থ হোয়াইটহেড এ রকমই একটা যৌক্তিক তন্ত্রে বেঁধে ফেলতে চাইলেন গণিতকে, এবং এর জন্য তাঁরা উদ্ভাবন করলেন 'স্তরভেদের তত্ত্ব' (theory of type) যেখানে তাঁরা ফ্রেইগের বিস্তারক্ষেত্রের ধারণাটিকে প্রশস্ত ও স্ববিরোধ-বর্জিত করার জন্য এনে ফেললেন পরপর কয়েকটি স্তরের (type) ধারণা। এর ভিতর সব চাইতে নিচের স্তরটি গঠিত হয়েছে নানান নির্দিষ্ট ধারণার বিস্তারক্ষেত্র নিয়ে, কিন্তু সব বিস্তারক্ষেত্র মিলিয়ে বিস্তারক্ষেত্রের যে সমগ্র ভুবন, সেটি আর ঐ স্তরের সদস্য নয়, সেটির 'অবস্থান' তার পরের স্তরে।

যুক্তির যে ভাষা নিচের স্তরে প্রযোজ্য, সেটি আর তার পরের স্তরে প্রযোজ্য নয়, তার জন্য চাই যৌক্তিক ভাষার সম্প্রসারণ। ফ্রেইগের মতই রাসেল 'সমাহার' কথাটি বেশি ব্যবহার করেন নি, তার বদলে তিনি সংগ্রহ (collection) কথাটি ব্যবহার করেছেন। তারঁ আলোচনায় 'সংগ্রহের সংগ্রহ' শব্দবন্ধটি স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়েছে (তবে 'সকল সম্ভাব্য সংগ্রহের সংগ্রহ', এটা কিন্তু পরবর্তী স্তরের ব্যাপার)। যেমন তাঁর (ও ফ্রেইগের) যৌক্তিক ছকে 'তিন' সংখ্যাটি বস্তুত একটি সংগ্রহের সংগ্রহ - এমন একটি সংগ্রহ যার সদস্যগুলি প্রতটিই আবার এক একটি (তিন সদস্যবিশিষ্ট) সংগ্রহ। এখানে দুটি সংগ্রহের ভিতরই 'তিন'-এর ধারণা আসছে বলে মনে হলেও সংকীর্ণতর সংগ্রহটির গঠনকৌশল যাতে প্রশস্ততরটির উপর নির্ভর না করে, সে দিকে নজর রেখেছিলেন নৈয়ায়িকেরা। কারণ, এক, দুই, ইত্যাদি সংখ্যাগুলির ধারণা তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'উত্তরসুরী' (successor) নামক ধারণাটির উপর। 'তিন' হল 'দুই'-এর উত্তরসুরী, 'দুই' 'এক'-এর, আর 'এক' হল 'শূন্য'-এর উত্তরসুরী - সবশেষে, 'শূন্য' হল এমন একটি ধারণা যার কোন বিস্তারক্ষেত্র নেই । এইভাবেই ফ্রেইগে প্রকৃত সংখ্যাগুলির সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন, এবং পরবর্তী দিনে গাণিতিকরা প্রকৃত সংখ্যার যৌক্তিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অনেকটা একই কৌশল অবলম্বন করেছেন (অবশ্য গণিত তথা গণিত-দর্শনের ভিন্ন ধারাও বর্তমান - সে আলোচনা পরে)।

> এর পর আমরা সমাহার তত্ত্বের আলোচনায় দেখব, কিছু 'স্বীকৃতি' থেকে শুরু করে এবং কিছু যৌক্তিক নীতি অনুসরণ করে গাণিতিকরা সমগ্র গণিতকে গড়ে তুলতে চান। এক্ষেত্রে তাঁরা 'পাটিগণিত' নামক তত্ত্বটি গড়ে তুলেছেন 'পেয়ানোর স্বীকৃতি' নামক এক প্রস্থ স্বীকৃতির ভিত্তিতে। পেয়ানোর স্বীকৃতি থেকে শুরু করলে স্বতন্ত্রভাবে আর প্রকৃত সংখ্যাগুলির যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য পেয়ানোর স্বীকৃতিগুলিকে সমাহার তত্ত্বের মৌলিক স্বীকৃতিগুলির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা যায়, এবং তখন প্রকৃত সংখ্যাগুলির যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রয়োজন দেখা দেয়।

ফ্রেইগে গণিতের যৌক্তিক নির্মাণ বলতে বোঝাতে চেয়েছিলেন গণিতকে এমন কিছু ধারণার উপর দাঁড় করাতে যেগুলি হবে সামান্যীকরনের শেষ কথা, যেগুলি কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট কিছুকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে নেই, কারণ বিশেষ বা নির্দিষ্ট কিছুকে অবলম্বন করা মানেই সামান্যতা হ্রাস, বিশুদ্ধ যৌক্তিকতা যা বরদাস্ত করে না। কিন্তু রাসেলের কূটটি দেখাল , 'বিস্তারক্ষেত্র' সে অর্থে বিশুদ্ধ যৌক্তিক ধারণা নয়, সব ধারণারই বিস্তারক্ষেত্র থাকতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা

নেই। সব ধারণারই বিস্তারক্ষেত্র আছে, এবং বিস্তারক্ষেত্রগুলির ভিতর যৌক্তিক বিচারে কোন তফাৎ নেই, এরকমটা ধরে নেওয়া মানেই স্ববিরোধ - রাসেল তাই ফ্রেইগের প্রকল্পকে এগিয়ে নিতে চাইলেন স্তরভেদের তত্ত্বটি অবলম্বন করে কারণ এই তত্ত্বে সকল সম্ভাব্য সংগ্রহ কিন্তু একই পর্যায়ভুক্ত নয়।

তবে শেষ পর্যন্ত রাসেলের পথও গণিতকে দিতে পারে নি সেই নির্বিশেষ সামান্যতা যা ছিল ফ্রেইগের অভীষ্ট লক্ষ্য। ফ্রেইগে প্রকৃত সংখ্যার যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তার ভিতর প্রচ্ছন্ন ছিল অভিধা-বিপর্যয়, যা এড়াতে গিয়ে রাসেল ও হোয়াইটহেডকে তাঁদের স্বতঃসিদ্ধগুলির তালিকায় অপনয়নের নীতি (principle of reducibility) নামক একটি নতুন সংযোজন ধরে নিতে হয়েছিল (সূত্র [GV], তৃতীয় অধ্যায়) । তবে তাঁদের তত্ত্বে অভিধা-বিপর্যয় বা তৎ-সম্পর্কিত কূটের অস্তিত্ব না থাকলেও, একেবারে সমস্যামুক্ত ছিল না সেটিও। যেমন, কিছু সংগ্রহ বা সমাহার, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ ও নির্দোষ, সেগুলি স্থান পায় নি তাঁদের তত্ত্বে । আর, সব চাইতে বড় কথা, তাঁদেরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ধরে নিতে হয়েছিল যে অসীম সংখ্যক ‘বস্তু’ বা সদস্য নিয়ে গঠিত সংগ্রহ বলে একটা কিছু আছে। এইভাবে অনন্তের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া , এটা আর যাই হোক, বিশুদ্ধ যৌক্তিকতার অভিজ্ঞান নয়। রাসেল নিজেও বুঝেছিলেন তা (সূত্র [Sh], পঞ্চম অধ্যায়), তবু তাঁর মনে হয়েছিল, ফ্রেইগের প্রকল্প গণিতকে দেবে সেই শুদ্ধতা ও সেই বিমূর্ততা যা একমাত্র গণিতেরই প্রাপ্য।

অনন্তের অস্তিত্ব আর অপনয়নের নীতি, এই দুইয়ের উপর নির্ভর করে রাসেল ও হোয়াইটহেড ক্রমশ সংখ্যার ধারণাটিকে আরো সম্প্রসারিত করলেন, কারণ শুধু প্রকৃত সংখ্যা সম্বল করে গণিত হয় না। রাসেলের আগে ডেডিকিন্ড নৈয়ায়িকতার দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করে সরল সংখ্যার (real number) গাণিতিক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, যেটি একই সঙ্গে ছিল তাঁর ও কান্টরের হাতে সমাহার তত্ত্বের গোড়াপত্তন। রাসেল ও সেই সময়ের নৈয়ায়িকেরা দৃষ্টি প্রসারিত করে ভবিষ্যতের যে ছবিটা তুলে ধরলেন তা হল, ক্রমশ ধাপে ধাপে সমগ্র গণিতই বিধৃত হবে যৌক্তিক কাঠামোয় ।

নৈয়ায়িকতা বলে, গণিতে যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। বাস্তবে কিন্তু তেমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যৌক্তিক স্বতঃসিদ্ধ ও যৌক্তিক উপপাদনের সূত্রগুলি পাওয়া যায় এক বিমূর্তকরন ও সামান্যীকরন প্রক্রিয়ায়, যা মানুষের বোধবৃত্তির এক সারসংক্ষেপ। এগুলি জগৎ সম্পর্কে কিছু বলে, এরা কিছু না কিছু অর্থ বহন করে । গাণিতিক বিবৃতি ও সত্যগুলি কোনটিই অর্থহীন নয়, এবং সে অর্থকে শুধুমাত্র যৌক্তিকতার সীমায় বাঁধা যায় না। যে কোন গাণিতিক বিবৃতি একটা কিছু বলতে চায়, যা তার অন্তর্গত পদবিন্যাস বা syntax থেকে ভিন্ন । ফ্রেইগে নিজে ভাষাতত্ত্বে শব্দার্থবিদ্যা বা semantics বিষয়ে খুবই মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন, এবং তাঁর যৌক্তিক তন্ত্রেও শব্দার্থবিদ্যার স্থান ছিল । বিভিন্ন ধারণার বিস্তারক্ষেত্রগুলি বস্তুত ঐ সব ধারণার ব্যাপ্তার্থ (denotation) সূচীত করে ।

> আমরা যখন শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে কিছু বলতে চাই তখন তার যেমন একটি ব্যাপ্তার্থ থাকে, তেমনই থাকে নিহিতার্থ (connotation) । ব্যাপ্তার্থ আমাদের জানায় আমরা কিসের সম্বন্ধে বলছি, আর নিহিতার্থ সেগুলির নানান অনুষঙ্গ সম্পর্কে আমাদের মনে সাড়া জাগায়। 'আমি মনে বড় ব্যাথা পেয়েছি' - এখানে 'মনে ব্যথা' বলতে বক্তার একটা বিশেষ মনোভাব বোঝানো হচ্ছে, এটি হল ব্যাপ্তার্থ । আর, একইসঙ্গে, এই কথার অনুষঙ্গ হিসেবে তিনি শ্রোতাকে আরো সূক্ষ্ম কিছুর ইঙ্গিত দিতে চাইছেন (যেমন, তিনি মনে ব্যথা পেলেন কেন), শ্রোতা সেটি ঠিকই বুঝে নেবেন - এটি হল নিহিতার্থ। ব্যাপ্তার্থের নির্দিষ্ট অবয়ব আছে, নিহিতার্থের সে রকম কোন অবয়ব নাও থাকতে পারে।

ফ্রেইগের যৌক্তিক তন্ত্রে বিস্তারক্ষেত্রগুলির ভূমিকা শব্দার্থসূচক (semantic), অথচ বিস্তারক্ষেত্র বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন নি । এবং, এই বিস্তারক্ষেত্র (অথবা রাসেলের পরিভাষায়, 'সংগ্রহ') নিয়েই দানা বাঁধতে থাকল যত গন্ডগোল। আসলে, গণিতের বিবৃতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্তির বাঁধনে বাঁধা ঠিকই, তবে সেগুলি কিন্তু নিরালম্ব নয়, কোন না কোন বস্তু বা ধারণা বা, এমনকি, অন্য কোন বিবৃতি সম্পর্কে কিছু বলতে চায় তারা , অর্থাৎ কোন না কোন অর্থের দ্যোতক সেগুলি । তাই, শব্দবিন্যাস বা syntax, আর শব্দার্থ বা semantics, এই দুইয়ের কোন একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কথা ভাবার কোন অবকাশ নেই । আর, শব্দার্থের ধারক ও বাহক হল সমাহার - ফ্রেইগের তত্ত্বে যা হল বিস্তারক্ষেত্র আর রাসেলের তত্ত্বে যা হল স্তরবিন্যস্ত নানান সংগ্রহ । ফ্রেইগের 'বিস্তারক্ষেত্র' আর রাসেলের 'সংগ্রহ' - এই দুইয়েরই

আনুষ্ঠানিক রূপ হল সমাহার, এবং এই সমাহারই শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হল গাণিতিক বিবৃতিগুলির ব্যাপ্তার্থ প্রকাশের প্রকৃষ্ট অবলম্বন ও বাহক রূপে।

শুদ্ধ যৌক্তিকতায় ধরা দেয় না গণিতের আত্মা। এক দিকে যৌক্তিক তত্ত্ব আর অপর দিকে উপযুক্ত বৈদগ্ধ্যে নির্মিত সমাহার তত্ত্ব, এই দুইয়ের মেলবন্ধনে মূর্ত হয় গণিতের অনন্তপ্রসারী অলৌকিক স্থাপত্য। যুক্তি যদি হয় গণিতের ভাষা, তবে সমাহার হল সেই ভাষার প্রকাশক্ষেত্র।

কান্টর ছিলেন সমাহার তত্ত্বের অন্যতম নির্মাতা, আর তাঁরই অনুসন্ধানের সূত্র ধরে সমাহার তত্ত্ব জন্ম দিল একগুচ্ছ মৌলক প্রশ্নের, যেগুলির উৎসবিন্দু একই - অনন্তের মাত্রা নিরূপণ। এগুলির মীমাংসা করতে হলে প্রথম প্রয়োজন দেখা দিল ডেডিকিন্ড-কান্টরের হাতে গড়া সমাহার তত্ত্বের একটি সুসঙ্গত ও বিদগ্ধ রূপ, যার নির্মাতা হয়ে এগিয়ে এলেন আর্নস্ট জারমেলো (1871-1953)। জারমেলোর হাতেই প্রথম গঠিত হল স্বতঃসিদ্ধ-আশ্রয়ী সমাহার তত্ত্ব (axiomatic set theory)।

পাঁচ।।

সমাহার তত্ত্ব: গণিতের 'ভিত্তি'।

জারমেলো সমাহার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করলেন কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকৃতির উপর, যেগুলি ছিল ইউক্লিডের জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধগুলির অনুরূপ। এই স্বতঃসিদ্ধগুলি থেকে শুরু করে যৌক্তিক উপপাদন প্রক্রিয়ায় পরের পর তৈরী হতে থাকবে নানান গাণিতিক বিবৃতি, নানান উপপাদ্য - গড়ে উঠবে সমগ্র গণিত। জারমেলোর স্বতঃসিদ্ধগুলিকে আরো সুসঙ্গত ও পরিণত রূপ দিলেন আব্রাহাম ফ্রেঙ্কেল (1891-1965) - নির্মিত হল জারমেলো-ফ্রেঙ্কেল সমাহার তত্ত্ব (Zermelo-Fraenkel set theory) বা, সংক্ষেপে, 'ZF তত্ত্ব'। এর পর ZF-এর স্বীকৃতিগুলির সঙ্গে যুক্ত হল 'চয়ন-স্বীকৃতি' বা axiom of choice নামক আর একটি স্বীকৃতি, এবং শেষ পর্যন্ত গণিতের মৌলিক মাধ্যম হিসেবে প্রতষ্ঠিত হল ZFC সমাহার-তত্ত্ব (Zermelo-Fraenkel set theory with Axiom of Choice)। এক দিকে এই ZFC তত্ত্ব আর অপর দিকে যুক্তিশাস্ত্র, এই দুইয়ের

মেলবন্ধনে রচিত হল ‘গণিতের ভিত্তি’। এবারে এই সমগ্র ব্যাপারটিকে ধরে সামান্য ব্যাখ্যা ও আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি।

> তবে তারও আগে একটু আলোচনা দরকার, ‘গণিতের ভিত্তি’ আর ‘গণিতের দর্শন’ এই দুইয়ের ভিতর সম্পর্ক কতটা নিবিড়, তা নিয়ে। আমরা ত চাইছি, গণিতের দর্শন বুঝতে (অবশ্য, প্রশ্ন উঠতে পারে, সেটাই বা কী বস্তু?), সেখানে গণিতের ভিত্তি নিয়ে চর্চার প্রয়োজন কোথায়? আসলে, গণিতের ভিত্তি হল, গণিত শাস্ত্রের ‘ভিতরকার’ ব্যাপার। আর দর্শন, সে অর্থে, কিছুটা হলেও, গণিতকে ‘বাইরে’ থেকে দেখা, মানুষের সামগ্রিক বৌদ্ধিক আর মানসিক চর্চা ও অনুসন্ধানের জমিতে দাঁড়িয়ে গণিতের তাৎপর্য অনুধাবন করা। তবে দুইয়ের ভিতর রয়েছে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন । ঊনবিংশ শতকের শেষে আর বিংশ শতকের গোড়ায় গণিত ও যুক্তিশাস্ত্রের কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন নাড়া দিয়েছিল গাণিতিকদের - প্রশ্ন উঠেছিল, গণিতের বিবৃতি ও উপপাদ্যগুলি কি তবে সংশয়াতীত নয়? গণিত একটা অমোঘ, অনিবার্য, ও সংশয়াতীত ব্যাপার, এ কথা কি তবে ঠিক নয়? গাণিতিকদের মিলিত চেষ্টায় একদিকে ফ্রেগে-রাসেলের যুক্তিশাস্ত্র ও অপর দিকে ZFC সমাহার তত্ত্ব, এই দুইয়ের মেলবন্ধনে তৈরী হল একটা সম্ভাবনা - গণিত শেষ পর্যন্ত হয়ত এবারে খুঁজে পাবে একটা শক্ত জমি, একটা মজবুত ভিত্তি - বস্তুত, এই জমিতে দাঁড়িয়েই গাণিতিকেরা এর পর দীর্ঘ একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঘটিয়েছেন গণিতের অকল্পনীয় অগ্রগতি। অবশ্য গণিত চর্চার বিস্তৃত ক্ষেত্রটিকে যদি ভাল করে লক্ষ করা যায়, তবে দেখা যাবে তার ভিতর বহু স্রোত, ধারা, উপধারা। আমরা যে সমাহার তত্ত্ব ধরে আলোচনা করছি, সেটি গণিতের এক প্রধান ধারা। বিগত শতকের শেষ অর্ধে এর পাশাপাশি আত্মপ্রকাশ করেছে আর একটি বিশাল স্রোতধারা - প্রকার-তত্ত্ব বা category theory; এ নিয়েও আমরা অল্প আলোচনা করব, তবে এও কিন্তু গণিতের ‘ভিতরকার’ ব্যাপার। সব মিলিয়ে গণিত শাস্ত্রকে ভিতর থেকে দেখলে দেখা যাবে, এ শাস্ত্র যে অমোঘ, অনিবার্য, ও সংশয়াতীত, এর কোন ব্যত্যয় নেই (বা, যদি থাকেও তবু তা অনেক গভীরের ব্যাপার, হয় ত আগামী দিনে কিছুটা বোঝা যাবে তা, তখন আসবে গণিতের আত্ম-সংশোধনের আর একটি পর্যায়)। তা, এ ত গেল গণিতের ভিত্তি। আর, গণিতের দর্শন? সে কথায় আসার আগে এবারে যুক্তিশাস্ত্র ও সমাহার তত্ত্ব প্রসঙ্গে কয়েকটি গোড়ার কথা সেরে নেওয়া দরকার, না হলে পরিষ্কার হবে না দর্শনের প্রশ্নগুলি।

আগেই বলেছি, যুক্তিশাস্ত্রের উপাদন হল কিছু সংযোজক, কিছু পারিমাণিক পদ (‘কোন এক’, ‘সকল’), আর প্রয়োজনমত কিছু ধ্রুবপদ, চলক, ও অপেক্ষকের নির্দেশী চিহ্ন, যেগুলির পৌনঃপুনিক প্রয়োগে সরলতর যৌক্তিক বিবৃতি থেকে গঠিত হয় জটিলতর বিবৃতি । যেমন, ‘x=2’, এটি একটি সরল বিবৃতি (এখানে x হল একটি চলকের নির্দেশী চিহ্ন), আর ‘[for every

x] x=2 [implies] x^2=4', এটি একটি জটিলতর বিবৃতি । এখানে implies একটি সংযোজক, এর অর্থ হল 'ফলশ্রুতি' (একটি বিবৃতির ফলশ্রুতি অপর একটি বিবৃতি), আর for every হল একটি পারিমাণিক শব্দ, x চলকের উপর প্রযুক্ত হয়ে যা কোন এক নির্দিষ্ট পাল্লার ভিতর সকল x-কে বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত করছে। উপরের দৃষ্টান্তে x^2 হল x-এর একটি অপেক্ষক (এ ক্ষেত্রে, x-এর বর্গ; বস্তুত, একে আপাতত 'অপেক্ষক' না বলে 'অপেক্ষক নির্দেশী চিহ্ন' বলাই সঙ্গত)। আর, এ সবের সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে গাণিতিক-সম্পর্ক নির্দেশী চিহ্ন (অপেক্ষক বা function, আর গাণিতিক-সম্পর্ক বা relation বস্তুত সমাহার তত্ত্বের ব্যাপার, যুক্তিশাস্ত্রের পরিধির ভিতর এগুলিকে নির্দেশ করার জন্য কিছু চিহ্ন প্রয়োজন হয়, আপাতত শুধু সেই চিহ্নগুলির কথাই বলছি)। ধরা যাক, 'x<y', এই বিবৃতিটির কথা ('x, y-এর চাইতে ছোট'), এখানে '<' হল একটি গাণিতিক-সম্পর্ক নির্দেশী চিহ্ন ।

> এখানে অল্প কিছু কথা বলে নিতে হচ্ছে, যার অন্তর্বস্তু কিছুটা গাণিতিক - হয় ত কারো কাছে অপরিচিত। এই সেই পরিস্থিতি যেখানে ছোট ভাই তার দাদাকে ডেকে বলেছিল - 'দাদা, পালিয়ে আয়, অঙ্ক শেখাচ্ছে.....!'

এই সব উপাদান নিয়ে গঠিত হয় কোন এক 'যৌক্তিক ভাষা' - এ রকম অসংখ্য যৌক্তিক ভাষা সম্ভব - তাদের ভিতর পার্থক্যের জায়গা হল প্রধানত ঐ অপেক্ষক আর সম্পর্ক নির্দেশী চিহ্নের তালিকায় । একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যৌক্তিক ভাষা হল 'পাটিগণিতের ভাষা' (language of arithmetic) - যেখানে 'উত্তরসূরী' অপেক্ষকটির জন্য একট চিহ্ন আছে, 'ঘাত' অপেক্ষকটি বোঝানোর জন্য একটি চিহ্ন আছে, আর 'তুলনায় ছোট' এই গাণিতিক-সম্পর্কটি বোঝানোর জন্য একটি চিহ্ন আছে।

যুক্তিশাস্ত্রের অপর উপাদান হল, কিছু যৌক্তিক স্বীকৃতি, আর উপপাদনের নিয়মতন্ত্র (rules of inference) । যেমন, 'দোষ করলে শাস্তি পেতে হবে / আমি দোষ করেছি // আমাকে শাস্তি পেতে হবে' -এখানে প্রথম দুটি বিবৃতি থেকে শেষের বিবৃতিটি পাওয়া গেছে পূর্বপদ-স্বীকার (modus ponens) নামক নিয়মটি প্রয়োগ করে। এই আলোচনায় আমি যৌক্তিক স্বীকৃতি আর উপপাদনের

নিয়মের (সূত্র [Le], দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ভিতর পার্থক্য করব না, এগুলিকে একযোগে ‘যৌক্তিক নীতি’ নাম দেব। গণিত-দর্শনের যাবতীয় চর্চা ও মতপার্থক্যের ভিতর এই যৌক্তিক নীতিগুলির স্থান গুরুত্বপূর্ণ।

তবে শুধু সংযোজক, শুধু কিছু চিহ্ন, বা শুধু উপপাদনের নিয়ম, এগুলির কোনই তাৎপর্য থাকে না, যদি না বলা হয়, এরা প্রযুক্ত হবে কিসের উপর, সেই কথাটি। এখানেই এসে পড়ে সমাহারের কথা। যৌক্তিক ভাষা প্রযুক্ত হয় কোন এক সমাহারের উপর, যা ঐ ভাষার ভুবন বা universe, অর্থাৎ প্রয়োগক্ষেত্র। একটি সমাহার একটি যৌক্তিক ভাষাকে দেয় একটি ‘গড়ন’ (structure) - যেমন, পাটিগণিতের যৌক্তিক ভাষা একটি গড়ন পায় প্রকৃত সংখ্যাগুলির সমাহারের ভুবনে। অবশ্য, যে কোন যৌক্তিক ভাষার একাধিক ভুবন থাকা সম্ভব, এবং ঐ ভাষায় প্রকাশিত কোন বিবৃতির ‘সত্যতা’র ধারণাটি নির্ভর করে সেটির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সব কটি ভুবনের উপর (সূত্র [Le], প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সমাহারের সদস্যগুলি যৌক্তিক ভাষার বিভিন্ন বিবৃতিকে দেয় নির্দিষ্ট অবয়ব। এই অবয়বের অঙ্গ-উপাঙ্গগুলি গঠিত হয় সমাহারের বিভিন্ন সদস্য বা তার নানান উপ-সমাহার (sub-set) সহযোগে। যেমন, প্রকৃত সংখ্যার সমাহারে পাটিগণিতের যৌক্তিক ভাষা প্রয়োগ করে পাওয়া যায় ‘3+4<9’, এই বিবৃতিটি - এখানে ‘3’, ‘4’, ও ‘9’ হল প্রকৃত সংখ্যার সমাহারের অন্তর্গত তিনটি সদস্য। তবে, ZFC হল একটি বিদগ্ধ সমাহার-তত্ত্ব - এখানে সমাহারগুলির সদস্যবৃন্দ কিন্তু সবই আবার ভিন্ন ভিন্ন সমাহার, আবার ঐ সব সদস্য-সমাহারগুলিও তৈরী হয়েছে সমাহার নিয়ে। এতে কিন্তু কোন গন্ডগোল নেই, কারণ সমাহার গঠনের প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ‘শূন্য-সমাহার’ (null set) দিয়ে - যে সমাহারে কোন সদস্যই নেই। এই শূন্য-সমাহার থেকে এবারে ধাপে ধাপে গঠিত হয় যাবতীয় বৃহত্তর সমাহার। সমাহার তত্ত্বের সকল বিবৃতিই শেষ বিচারে দাঁড়িয়ে আছে ZFC-র মৌলিক স্বীকৃতিগুলির উপর (সূত্র [GV], তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সমাহার তত্ত্বের মৌলিক গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে চর্চার সিংহভাগ নিয়োজিত এই স্বীকৃতিগুলি নিয়ে, যার ভিতর আবার অন্যতম হল চয়ন-স্বীকৃতি, কারণ এই চয়ন-স্বীকৃতি, আর অবিচ্ছিন্নতার অনুমান, এই দুটি নিয়ে গাণিতিকরা কিছুটা হলেও দ্বিধাগ্রস্ত। গণিতের যে কোন শাখাতেই প্রারম্ভিক স্বীকৃতিগুলি কিন্তু যৌক্তিকতার বাইরের ব্যাপার - ‘বহির্জগৎ’ থেকে আহরিত নানান ধ্যান-ধারণা থেকে শুরু করে

সেগুলির অনেক গভীরে গিয়ে দীর্ঘ বিশ্লেষণ, সামান্যীকরন ও বিমূর্তকরন প্রক্রিয়ায় গঠিত সেগুলি । যে কোন শাখাতেই এই প্রারম্ভিক জায়গা থেকে শুরু করে তার পর চলে বিশুদ্ধ যৌক্তিক প্রক্রিয়া। তবে আগেই বলেছি, এই যৌক্তিক প্রক্রিয়ার বিশুদ্ধতাও প্রশ্নাতীত নয়। যৌক্তিক প্রক্রিয়াগুলি কতটা সর্বজনীন, একদিকে সেই প্রশ্ন, আর সমাহার তত্ত্বের স্বীকৃতিগুলিই বা কতটা বিকল্পবিহীন (গণিতের যে কোন নির্দিষ্ট শাখার স্বীকৃতিগুলি শেষ পর্যন্ত গ্রথিত সমাহার তত্ত্বের স্বীকৃতিগুলির সঙ্গে), সে প্রশ্ন, এ দুটি হল 'গণিতের ভিত্তি' প্রসঙ্গে দুই অন্যতম জিজ্ঞাসা, এবং সে জিজ্ঞাসার সূত্রেই গণিতের ভিত্তি আর গণিতের দর্শন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত । সে আলোচনায় আসব পরে। গণিতের ভিত্তি বিষয়টির সঙ্গে সামান্য পরিচিত হয়ে এবারে আমরা ফিরে আসব গণিতের দর্শনে। এবং, প্রথমে পরিচিত হব গণিত-দর্শনের দুটি অন্যতম ধারার সঙ্গে ।

ছয় ।।

দুই ধারা: প্লেটো-বাদ ও বোধ-বাদ।

নৈয়ায়িকতা গণিত-দর্শনের একটি ধারা । আগেই বলেছি, শুদ্ধ নৈয়ায়িকতার কাঠামোয় সমগ্র গণিতের হদিশ পাওয়া সহজ নয়, কারণ প্রতিটি গাণিতিক বিবৃতিই নির্দিষ্ট কিছু বলতে চায়, যা নির্বিশেষ নয়, অর্থাৎ যা কিনা যৌক্তিক সামান্যীকরনের বাইরের ব্যাপার । অবশ্য একটা কথা প্রথমে বুঝে নিতে হবে - গণিতের বিবৃতিগুলি কিন্তু সরাসরি 'বহির্জগৎ' সম্পর্কে কিছু বলে না - সেগুলি যা বলে তার সবই সীমিত সমাহারের ভুবনের ভিতর, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে এগুলির সঙ্গে ঐ বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব (এটিই হল বিজ্ঞানের নানান তত্ত্বে গণিতের প্রয়োগযোগ্যতার বহু-আলোচিত প্রশ্ন; আমরা আসব সে প্রশ্নে) । বহির্জগতের সঙ্গে গণিতের সম্পর্ক কেবল যৌক্তিক নীতি আর গাণিতিক স্বীকৃতিগুলির মাধ্যমে । একবার এই প্রারম্ভিক জায়গা থেকে শুরু করার পর গণিতের যা কিছু নির্মাণ, সে সবই অমোঘ, অনিবার্য, ও সংশয়াতীত। এখানেই গণিতের জোর, আবার এখানেই গণিত-দর্শনের নানান মত, নানান বিশ্লেষণ।

আচ্ছা, গণিতের বিবৃতিগুলি যদি অনিবার্য, অমোঘ, ও সংশয়াতীত হয়, তবে এ কথা কি বলা যায় না যে সেগুলির লোকোত্তর কোন অস্তিত্ব আছে ? দার্শনিক প্লেটোর মতে গণিতের সত্যগুলি সবই

লোকোত্তর - এগুলি অনাদি, মনুষ্য-নিরপেক্ষ ও বস্তুজগৎ-বহির্ভূত। এগুলির অস্তিত্ব এমন এক জগতে যা আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যা আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের অতীত।

এখানে গণিতের বিবৃতি বলতে আমি সেগুলিকেই বোঝাচ্ছি যেগুলি 'সত্যতা' গুণবিশিষ্ট। যেমন, '$\sqrt{2}$ একটি অমূলদ সংখ্যা' - এটি একটি সঠিক বিবৃতি, কিন্তু '3/4 একটি অমূলদ সংখ্যা', এই বিবৃতিটি সত্য নয়। গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রে 'সত্যতা'র ধারণাটি খুব সরল নয়। আমাদের বাস্তব জগতে ও জীবনেও সত্যতার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট জটিল। প্রথম দর্শনে মনে হয়, 'সত্যতা নিয়ে আবার জটিলতা কী হতে পারে? বাস্তবে যা ঘটেছে বা ঘটছে সেটাই সত্য'। অথচ, একটু খোলা মনে ভাবলেই বোঝা যায়, তা নয় - তা যদি হত তবে জীবন হত অনেক মসৃণ। 'রামবাবু ঘরে বসে কাঁদছেন', এটি অপেক্ষাকৃত সরল সত্য - একটু তদন্ত করে দেখলেই বোঝা যাবে, তিনি হয়ত সত্যিই কাঁদছেন। কিন্তু 'মানুষের অধঃপতন সইতে না পেরে রামবাবু ঘরে বসে কাঁদছেন' - এই বিবৃতিটি অতটা সরল নয়, এর সত্যতা নির্ধারণ অনেক দুরূহ। আগেই বলেছি, গণিতের জোরের জায়গাই এই যে গণিতের জগৎ বাস্তব জগৎ থেকে ভিন্ন, তাই গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রে সত্যতার ধারণাটি অত বিভ্রান্তিজনক নয়, তবে আবার খুব যে সরল, তাও নয়। সত্যতার বিষয়টি নিয়ে গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছিলেন আলফ্রেড টার্সকি (1901-1983)। কোন বিবৃতি যে ভাষায় কোন একটি জগতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কিছু বলতে চাইছে, সত্যতার ধারণাটি তার ঊর্ধতর কোন এক ভাষার ব্যাপার (বাংলা, ইংরেজী, ইত্যাদি যে কোন প্রাকৃতিক ভাষা একা হাতেই দুই দায়িত্ব পালন করে)। গণিতের কোন শাখায় যখন কোন এক যৌক্তিক ভাষায় একটি বিবৃতির সত্যতার প্রশ্ন ওঠে, তখন এমন এক বা একাধিক সমাহারের কথা ভাবতে হয়, যেগুলির সাপেক্ষে নির্ধারিত হয় সেটির সত্যতা (এই সমাহারগুলি ঐ ভাষাকে দেয় এক একটি গড়ন বা structure)। তবে সত্যতা গুণটি ঐ ভাষার বিন্যাসগত (syntactic) বিষয় হলেও, বিন্যাসের দিগন্ত ছাড়িয়ে সত্যতার ধারণাটি প্রসারিত হয় শব্দার্থের দিকে, অর্থাৎ সত্যতার *ধারণাটি* কিন্তু ঐ ভাষার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়।

তবে সত্যতার ধারণাটির যথাযথ বিশ্লেষণ যাই হোক, গাণিতিক সত্যতা এমন এক ব্যাপার যাতে নেই কোন সংশয়ের ছোঁয়াচ, কোন জাগতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তা হলে একে লোকোত্তর বলতে বাধা

কোথায়? গাণিতিক সত্যের জগৎ এমন এক জগৎ যা আমাদের পরিচিত দেশ-কালের গন্ডীর বাইরে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা এমনকি সমগ্র মনুষ্য-জাতিরও বোধ-নিরপেক্ষ তা। '$\sqrt{2}$ একটি অমূলদ সংখ্যা', এই সত্য কি মানুষের বোধ-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে? পৃথিবীতে যখন মানুষ ছিল না তখন কি সেটি একটি অমূলদ সংখ্যা ছিল না, বা সুদূর ভবিষ্যতে যখন মানুষ থাকবে না, তখন কি সেটি একটি মূলদ সংখ্যায় পরিণত হবে ? তা হলে ত গাণিতিক সত্যগুলি লোকোত্তর। আমাদের চেনা এই জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি গাণিতিক জগৎ নিশ্চই আছে, যে জগতে অধিষ্ঠান করে ঐ সত্যগুলি। এটিই হল গণিতে প্লেটো-বাদ। গণিতের সেই জগৎ এক ভিন্ন বাস্তবতার জগৎ। গাণিতিকের কাজ হল একে একে সেই জগতের 'অধিবাসী'দেরকে 'আবিষ্কার' করা - তিনি গাণিতিক সত্যগুলিকে 'উদ্ভাবন' করেন না, আবিষ্কার করেন। প্লেটো-বাদকে অনেক সময় গাণিতিক বাস্তবতা-বাদও (mathematical realism) বলা হয়, কারণ এটা এমন এক বাস্তবতার কথা বলে যা আমাদের চেতনা-নিরপেক্ষ। তবে এই বাস্তবতা-বাদ কিন্তু বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা-বাদ (scientific realism) থেকে ভিন্ন (যদিও বিখ্যাত দার্শনিক কুয়াইন (1908-2000) এ দুটিকে এক করেই দেখেছিলেন; সে কথায় পরে আসছি), কারণ দুইয়ের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক।

প্লেটো-বাদ অনুযায়ী, গাণিতিক সত্য একদিকে যেমন চেতনা-নিরপেক্ষ, অপর দিকে তেমনই আবার লোকোত্তর। আচ্ছা, তাই যদি হবে তবে গাণিতিক সত্যের হদিশ আমরা পাই কি ভাবে? প্লেটো-বাদকে যদি সঠিক বলে ধরতে হয়, তবে ত এ কথাও মানতে হবে যে গাণিতিক সত্যগুলি সবই আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে - গাণিতিক তবে তাদেরকে আবিষ্কার করবেনই বা কী ভাবে ? কার্ট গোয়েডেল এই রহস্যের মীমাংসা করেছিলেন এই বলে যে আসলে আমরা গাণিতিক সত্যগুলির নাগাল পাই আমাদের এক আদি-বোধ বা অন্তর্দৃষ্টির (intuition) সাহায্যে। সম্মানে ও মর্যাদায় গোয়েডেল নৈয়ায়িক ও গাণিতিকদের মধ্যে একদম প্রথম সারির মানুষ, কারণ গোয়েডেল জগৎকে দিয়েছেন এমন কয়েকটি আশ্চর্য উপপাদ্যের সন্ধান যা তাঁকে করে রাখবে চিরস্মরণীয়। তাই, গোয়েডেল যা বলছেন তা অস্বীকার করা তেমন কাজের কথা নয়। বস্তুত, বহু প্রথম সারির গাণিতিকই তাঁদের কাজের দার্শনিক দৃষ্টিকোণ বলতে ঐ গাণিতিক-বস্তুবাদকেই স্বীকার করে নেন। তবে অনেকে আবার একেবারেই পছন্দ করেন না ঐ আদি-বোধ বা অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপারটিকে। শুনতে এটি অনেকটা কান্টীয় আদি-বোধের মত, যদিও কান্ট তাঁর আদি-বোধের

ধারণাটি প্রয়োগ করেছিলেন ভিন্ন প্রেক্ষিতে । আর, প্লেটো ত সরাসরি এই আদি-বোধের ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর গণিত-দর্শনকে ।

প্লেটো-বাদের দিগন্ত ছাড়িয়ে গণিত-দর্শনকে কোন প্রশস্ততর ক্ষেত্রে দাঁড় করান যা কি না, তা নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করব, তবে আপাতত আমরা গণিত-দর্শনের যে দ্বিতীয় ধারাটির কথা বলব, তা হল বোধ-বাদ বা intuitionism - এই বোধ-বাদ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী।

বোধ-বাদের প্রবর্তন করেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক ব্রাউয়ার (1881-1966)। ব্রাউয়ারও শুরু করেছিলেন কান্টীয় আদি-বোধ থেকে, কিন্তু আদি-বোধকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নিজের মত করে। তাঁর মতে প্রকৃত সংখ্যার ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত সময় সংক্রান্ত এক আদি-বোধের উপর, এবং এই আদি ধারণা থেকে শুরু করে গণিতের অন্য সকল ধারণা গাণিতিকদের মানসিক ক্রিয়া সঞ্জাত - গাণিতিক যখন কোন সত্যের সন্ধান পান তখন তিনি তা আবিষ্কার করেন না, বস্তুত তিনি ঐ সত্যটি নির্মাণ করেন বা, এক অর্থে বলা চলে, উদ্ভাবন করেন। বোধ-বাদের অন্যতম প্রধান বক্তব্য হল, গণিত মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষ নয়, আর গাণিতিক সত্যের কোন ভিন্ন জগৎও নেই । বোধ-বাদ মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষ গাণিতিক সত্যকে স্বীকার করে না বলে একে অনেক সময় গাণিতিক ভাববাদও আখ্যা দেওয়া হয়, যা বাস্তবতাবাদের পরিপন্থী।

বোধ-বাদ শুধু গণিত-দর্শনের একটি ধারাই নয়, এটি গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রেরও একটি স্বতন্ত্র ধারা, আবার গণিত-চর্চার ক্ষেত্রেও বোধ-বাদী গণিত একটি অন্যতম ধারা । ব্রাউয়ার যখন বোধ-বাদের কথা ভেবেছিলেন তখন তিনি বস্তুত চেয়েছিলেন গণিত-শাস্ত্রের একটি সার্বিক সংশোধন, কারণ তাঁর মতে গণিত-চর্চার দৃষ্টিকোণটিতে (অর্থাৎ দর্শনে) ছিল মৌলিক ভ্রান্তি, গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল ভ্রান্ত যৌক্তিক নীতির উপর, আর তারই ফলে গণিত-চর্চার ক্ষেত্রটি সংক্রামিত হয়েছিল ভ্রান্তি-দোষে । বোধ-বাদের মতে, এই তিনটিরই মূল হল গাণিতিক বাস্তবতা সম্পর্কে এক অলীক ধারণা। এই অর্থে বোধ-বাদের অবস্থান, বস্তুত, গাণিতিক বাস্তবতা-বাদের বিপরীতে। বোধ-বাদী যৌক্তিক নীতি ও গণিত-চর্চার বিপরীতে গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্র ও গণিত-চর্চার যে প্রচলিত প্রধান ধারাটি, তাকে অনেক সময় ‘চিরায়ত যৌক্তিক নীতি’ (classical logic) এবং

‘চিরায়ত গণিত’ (classical mathematics) নামে চিহ্নিত করা হয়, যা মূলত বাস্তবতা-বাদী গাণিতিক দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । এবারে আমরা বোধবাদী দর্শন, যৌক্তিক নীতি ও গণিত সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা জেনে নেব। এ ক্ষেত্রে আমরা আর এই তিনিটির স্বাতন্ত্র্য আলাদাভাবে উল্লেখ করব না - প্রসঙ্গ থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না, কোনটির কথা বলতে চাইছি।

আগেই বলেছি, বোধ-বাদ এমন কিছুই স্বীকার করে না যা আমাদের মানসিক নাগালের বাইরে। এর ভিতর প্রধান হল অনন্ত সমাহারকে (অর্থাৎ যে সমাহারের সদস্য-সংখ্যা অনন্ত) সসীম সমাহারের মত করে দেখা, একটা অনন্ত সমাহার সম্পর্কে কোন বিবৃতির বেলায় হয় ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ এই দুটি মাত্র বিকল্প স্বীকার করা । গাণিতিক বাস্তবতাবাদ বলে, বিবৃতিটি যদি সত্যি হয়, তবে ত অবশ্যই তা গণিতের যে লোকোত্তর জগৎ সেই জগতে রয়েছে, হয় ত এখন পর্যন্ত আমাদের গাণিতিক অন্তর্দৃষ্টি তার সন্ধান পায় নি, কোনদিন হয় ত আবিষ্কৃত হবে তা। আর যদি বিবৃতিটি সেই জগতে না থাকে তবে তা সত্যি নয়, এখানেই মিটে গেল ব্যাপারটা। অর্থাৎ ‘সত্য’ একটা বাস্তব ব্যাপার, আমাদের বোঝা না-বোঝা, জানা না-জানার উপর নির্ভর করে না তা, আমরা তার নাগাল পেলাম কি পেলাম না, সে নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই তার - সে আছে তার জায়গায় - সেই সত্যের সন্ধান পেতে আমাদের যদি অনন্ত সমাহারের সাহায্য নিতে হয়, হবে, যদি অনন্ত সমাহারকে সসীম সমাহারের মত করে ভাবলে কাজ দেয়, তবে তাই সই। বোধ-বাদের বক্তব্য, প্রকৃত সংখ্যার সমাহারের যে ব্যাপ্তিমান, সেই ব্যাপ্তিমান-বিশিষ্ট সমাহার নিয়ে তেমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়, কিন্ত তার চাইতে বেশি ব্যাপ্তিমান মানেই অজানায় ঝাঁপ দেওয়া । স্মরণ করা যেতে পারে, সরল সংখ্যাগুলির সমাহারের ব্যাপ্তিমান প্রকৃত সংখ্যার সমাহারের ব্যাপ্তিমানের চাইতে বেশি - এই দুইয়ের ভিতর কোন ব্যাপ্তিমানের অস্তিত্ব আছে কি না, চিরায়ত গণিতে তার উত্তর জানা নেই - অবিচ্ছিন্নতার অনুমান বলে, এরকম মাঝামাঝি কোন ব্যাপ্তিমান নেই। বোধবাদী গণিতের গোঁড়া সমর্থকের মতে অবিচ্ছিন্নতার অনুমানটি, বস্তুত, কোন অর্থ বহন করে না, কারণ এর জন্য প্রয়োজন পড়ে একটি অনন্ত সমাহারের ‘ঘাত-সমাহার’ (power set) নামক ধারণাটির, যা বোধবাদী দর্শনের পরিপন্থী। ব্রাউয়ার ছিলেন কান্টরের ভক্ত, তাই অনন্ত সমাহার নিয়ে কান্টরের চর্চার যে বিশাল ব্যাপ্তি, তা তিনি মেনে নিতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছেন অবিচ্ছিন্নতার অনুমানটিকে একটা নির্দিষ্ট মীমাংসার জায়গায় নিয়ে আসতে ।

কার্ট গোয়েডেল আর পল কোহেন (1934-2007), দু জনে দু দিক থেকে দেখিয়েছিলেন, অবিচ্ছিন্নতার অনুমানটি ZFC-এর পরিপন্থী নয়, আবার এই অনুমানের যে নেতি-বিবৃতি সেটিও পরিপন্থী নয় (যুক্তিশাস্ত্র বলে, প্রতিটি বিবৃতিরই একট নেতি-বিবৃতি আছে, যা্র বক্তব্য ঐ বিবৃতির বিপরীত)। তবে চিরায়ত গণিতের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, অবিচ্ছিন্নতার অনুমানটি হয় সত্যি, আর না হয় ত সত্যি নয়, এর বাইরে আর কিছু হতে পারে না; ZFC থেকে যদি এ বিষয়ে কোন মীমাংসায় পৌঁছন না যায় তবে এটাও হতে পারে যে, ZFC-এর স্বীকৃতিগুলি হয়ত অসম্পূর্ণ (গোয়েডেল এই মতই পোষণ করতেন)। একইভাবে, চয়ন-স্বীকৃতিটিও ZF-এর স্বীকৃতিগুলির সঙ্গে এই ভাবেই সম্পর্কিত। অসীম সংখ্যক সমাহারের একটি গুচ্ছ যদি কল্পনা করা যায়, যার কোনটিই শূন্য-সমাহার নয়, তবে এমন এক সমাহার নিশ্চই থাকবে যার ভিতর ঐ গুচ্ছের প্রতিটি সমাহার থেকে একটি (এবং একটিমাত্র) সদস্য উপস্থিত থাকবে - এটিই হল চয়ন-স্বীকৃতি। স্পষ্টতই, অনন্ত সমাহার নিয়ে চিরায়ত গণিতের যে দৃষ্টিকোণ, তাতে চয়ন-স্বীকৃতি বা অবিচ্ছিন্নতার অনুমান, অথবা ঐ জাতীয় অন্য কোন বিবৃতি নিয়ে উদ্বেগ থাকার কথা নয়, কেবল প্রশ্ন থাকার কথা, সেগুলি সত্যি কি সত্যি নয়। চয়ন-স্বীকৃতির বেলায় সে প্রশ্ন ওঠে না, কারণ চিরায়ত গণিতের গাণিতিকেরা এটিকে একট মৌলিক স্বীকৃতি বলে মেনে নিয়েছেন - এটিকে স্বীকৃতি হিসেবে ধরে গণিতের বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্যের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এমনকি, চয়ন-স্বীকৃতির সঙ্গে অপর একটি অনুমান মিলিয়ে অবিচ্ছিন্নতার অনুমানেরও প্রমাণ সম্ভাব, তবে ঐ অতিরিক্ত অনুমানটি ZFC-এর মৌলিক স্বীকৃতির ভিতর পড়ে না। এখানেই এসে পড়ছে চিরায়ত গণিতের সেই গোড়ার প্রশ্ন - সত্যতা আর প্রমাণ (অর্থাৎ, যাথার্থ্য নিরূপণ), এই দুইয়ের ভিতরকার প্রভেদ। বোধ-বাদ এই প্রভেদ স্বীকার করে না।

কোন বিবৃতির প্রমাণ বলতে বোঝায় এমন এক যুক্তি-পরম্পরা যা কয়েকটি প্রারম্ভিক বিবৃতি থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে আমাদেরকে পৌঁছে দেয় ঐ উদ্দিষ্ট বিবৃতিতে, যেটি হল যুক্তি-পরম্পরার অন্তিম ধাপ - অবশ্য পর পর ধাপগুলিকে সুনির্দিষ্ট ও সসীম সংখ্যক হতে হবে, না হলে 'প্রমাণ' কথাটির কোন অর্থ থাকে না। প্রারম্ভিক থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত যতগুলি বিবৃতি তার সবই হতে হবে হয় কোন স্বীকৃতি আর না হয় ত এমন কোন বিবৃতি যা অন্য কোন অনুরূপ বিবৃতি থেকে যৌক্তিক উপপাদনের নিয়ম ধরে পাওয়া। এই যৌক্তিক নিয়মগুলি এমনই যে তারা কখনো

সত্যতা হরণ করে না । তাই, স্বীকৃতিগুলিকে ‘সত্য’ ধরে নিলে, প্রমাণ বা উপপাদন প্রক্রিয়ায় পাওয়া সকল বিবৃতিই সত্য হবে।

বিবৃতি হল যৌক্তিক ভাষার ব্যাপার (যেমন, সমাহার তত্ত্বের ভাষা, পাটিগণিতের ভাষা, ইত্যাদি), আর সেই বিবৃতির সত্যতা নির্ধারিত হয়, ভাষার সাপেক্ষে প্রাসঙ্গিক নানান গড়ন বা structure দিয়ে, কারণ প্রতিটি গড়নেই বিবৃতিটিকে সিদ্ধ হতে হবে - কোন একটি গড়নে সত্য হলেও সেটির সত্যতা সর্বজনীন নাও হতে পারে । ঠিক এই কারণেই সত্যতার ধারণাটি জটিল, এবং, সত্যতা ও প্রমাণ দুই ভিন্ন ব্যাপার। চিরায়ত গণিতের বক্তব্য হল, যে বিবৃতির প্রমাণ আছে, তা সত্য (কোন তত্ত্বের এই গুণটিকে বলা হয় সুস্থতা বা soundness), কিন্তু বিপরীতে এ কথা বলা চলে না যে, যা সত্য তাই প্রমাণযোগ্য - এটি হল গোয়েডেলের একটি প্রসিদ্ধ উপপাদ্য।

> এই নিবন্ধে আমার কোন কথাই কিন্তু গাণিতিক বিচারে নিখুঁত নয় - আমি যা বলছি বা যে ভাবে বলছি, তা সঠিক গাণিতিক বক্তব্যের একটা আলগা ভাষ্য ছাড়া আর কিছু নয়, যার উদ্দেশ্য হল সঠিক গাণিতিক বক্তব্যগুলি কি, তার একটা আভাষ দেওয়া।

বোধ-বাদ কিন্তু প্রমাণের অতীত কোন সত্যতাকে স্বীকার করে না। যা প্রমাণযোগ্য, তাই সিদ্ধ, তার বাইরে কোন সত্যের অস্তিত্ব ধরে নিতে গেলে সেটা হয়ে দাঁড়ায় লোকোত্তর অস্তিত্বের স্বীকৃতি। প্রমাণ হল সেই মানসিক ক্রিয়া যার সাহায্যে সম্ভব হয় গাণিতিক সত্যের নির্মিতি - তার বাইরে আরো সত্য আছে, এটা ধরে নেওয়ার অর্থ, বস্তুত, অনন্তের ওপারে কী আছে তা নিয়ে অসার চর্চা।

অর্থাৎ বোধ-বাদ, আর চিরায়ত গণিতের বাস্তবতা-বাদ, এই দুটিই কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বিপরীত তাৎপর্য বহন করে । বাস্তবতা-বাদ, নামে বাস্তবতা-ভিত্তিক হলেও সে বাস্তবতা আসলে একটা অনির্বচনীয় ব্যাপার, যার মূল কথা হল কোন এক লোকোত্তর জগতে গাণিতিক সত্যতার অস্তিত্ব। আর, বোধ-বাদ ভাববাদী দর্শন আখ্যা পেলেও তা লোকোত্তর অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয় না - যা ‘হাতে-গরম’, অর্থাৎ যার প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাই সত্য, তার বাইরে আর কিছু আছে কি না

তাই নিয়ে ভাবার কোন অর্থই নেই । বোধ-বাদের মতে একজন গাণিতিক যখন কোন গাণিতিক বিবৃতি প্রমাণ করেন তখন সেটিকে তুলনা করা যায়, এক ভাস্কর যেন এক মূর্তি গড়লেন। ভাস্কর যে সব মূর্তি গড়ে তুলেছেন সেগুলিই বাস্তব, তিনি যা গড়েন নি তা নিয়ে চর্চার কোন জায়গাই নেই - যখন আবার নতুন কোন মূর্তি গড়বেন তিনি তখন তাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রসারিত হবে বাস্তবতার বর্তমান জগৎটি। আর, বাস্তবতা-বাদের মতে, অসংখ্য মূর্তি স্বতঃ-নির্মিত হয়ে অবস্থান করছে স্থান-কালের অতীত এক শাশ্বত লোকে, গাণিতিক তার এক একটিকে খুঁজে বার করছেন মাত্র - এমনও হতে পারে, কোন মূর্তিকে হয়ত খুঁজে পাওয়া সম্ভবই হবে না, তবু তাতে তার অস্তিত্ব ক্ষুণ্ন হবে না কোন মতেই ।

বোধ-বাদকে ব্যাপকতর অর্থে নির্মিতিবাদ (constructivism) বলা যেতে পারে, কারণ গণিতের সবটাই হল নির্মাণ - ভাস্করের মূর্তি নির্মাণের মত । তবে গণিতের চিরায়ত দর্শন আর বোধ-বাদী দর্শন, এদের ভিতর ব্যবধান ত গণিতের 'বাইরের' ব্যাপার, এ নিয়ে তর্ক ত অনন্তকাল ধরেই চলতে পারে, গণিতের 'ভিতরকার' চর্চায় এই ব্যবধানের লক্ষণ কী? নির্মিতিবাদী গণিতের ভাণ্ডার অতি সমৃদ্ধ, যদিও চিরায়ত গণিতের চাইতে কিছুটা ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে তা । গণিতের বহুসংখ্যক উপপাদ্য দুই ধরনের গাণিতিক চর্চায়ই প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলির ব্যাখ্যা, অর্থ, বা তাৎপর্য সর্বদা এক নয়। আবার চিরায়ত গণিতের কিছু উপপাদ্য আছে যেগুলি অনন্ত-সম্পর্কিত বলে নির্মিতিবাদী গণিতের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী তা অর্থহীন । বোধ-বাদী দর্শনের প্রথম পর্যায়ে গাণিতিকরা একে পরিহার করে চলতেন - তাঁদের মতে বোধ-বাদের প্রভাবে পড়া মানেই গণিতের বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ চর্চা থেকে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। কারণ বোধ-বাদ, তাঁদের মতে, মারাত্মকভাবে সীমিত করে গণিতে যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্রটিকে।

বোধ-বাদ যে যৌক্তিক নীতিটিকে গোড়া থেকেই নাকচ করে তা হল, মধ্যবিকল্প-বর্জনের নীতি (principle of excluded middle) । কোন নির্দিষ্ট বিবৃতি আর তার নেতি-বিবৃতি, এই দুইয়ের বাইরে কোন বিকল্প নেই, এটাই চিরায়ত যুক্তিশাস্ত্রের বক্তব্য। '$x=2$' (বিবৃতি) আর '$x\neq2$' (নেতি-বিবৃতি) এই দুটি ছাড়া আর কিছু ত সম্ভবই নয় । বোধ-বাদ কিন্তু এ কথা বলে না যে, তার বাইরেও কিছু থাকতে পারে, বোধ-বাদ বলে, হয় 'হ্যাঁ', আর না হয়ত 'না', এই নীতিটিই অর্থহীন।

বোধ-বাদী যুক্তিশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল ব্রাউয়ার, তাঁর ছাত্র হেইটিং (1898-1980), আর বিখ্যাত রুশ গাণিতিক কোলমগোরভ (1903-1987), এই তিন জনের স্বতন্ত্র অবদান নিয়ে। দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র, আর গণিত, এই তিন বিষয়ের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের নাম যুক্ত বোধ-বাদী চিন্তাধারা ও চর্চার সঙ্গে।

এই যে 'হ্যাঁ'-'না'-এর দ্বি-ভিত্তিক (dichotomous) ভাবনা, এতে ধরে নেওয়া হচ্ছে, আমাদের বোধ-নিরপেক্ষ ভাবে কোন বিবৃতির সত্যতা পূর্ব-নির্ধারিত - সত্যতার একটা স্বতঃ-নির্ধারিত অস্তিত্ব রয়েছে, এবং তা রয়েছে গণিতের সেই অনির্বচনীয় জগতে। তা হলে প্রশ্ন হল, মধ্যবিকল্প বর্জন যদি অর্থবহ যৌক্তিক নীতি না হয়, তবে একে বাদ দিয়ে গণিতের চেহারা কী দাঁড়াবে? কারণ গণিতের অসংখ্য প্রমাণ দাঁড়িয়ে আছে এই নীতির উপর। অনেক সময়ই কোন বিবৃতি প্রমাণ করতে গিয়ে প্রথমে বলা হয়, 'ধরা যাক, বিবৃতিটি ভুল', এবং তার পর দেখান হয়, এটা ধরে নিলে একটি স্ববিরোধের ভিতর গিয়ে পড়তে হচ্ছে - অর্থাৎ 'নেতির নাকচন' (double negation) থেকে ধরে নেওয়া হয়, বিবৃতিটি প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু সত্যতা প্রতিষ্ঠা বলতে বোধ-বাদ বোঝে একমাত্র সরাসরি প্রমাণ (যাকে বলা চলে গাণিতিক 'নির্মাণ')। কোন বিবৃতি যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তার নেতি-বিবৃতিটি নাকচ হয়, এটা অবশ্যই ঠিক, কিন্তু এর বিপরীত দাবী বোধ-বাদের অভিধানে টেঁকে না। তবে গণিতের উপপাদ্যগুলি কি সব খারিজ হয়ে যাবে? (মৌলিক সংখ্যাগুলির কোন শেষ নেই, অর্থাৎ বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা বলে কিছু থাকতে পারে না - ইউক্লিড এই উপপাদ্যটির যে প্রমাণ দিয়েছিলেন - গণিতের ইতিহাসে সম্ভবত সব চাইতে পরিচিত সেই প্রমাণটিও এই নেতির নাকচন থেকেই পাওয়া)। বোধ-বাদ এই সব উপপাদ্যের অনেকগুলিই প্রতিষ্ঠিত করে তার নিজের মত করে, অনেকগুলিকে অর্থহীন বলে অগ্রাহ্য করে, অনেকগুলিকে গ্রহণ করে সামান্য ভিন্ন অর্থে (যেমন, ইউক্লিডের উপপাদ্যটিকে গ্রহণ করে এই বলে যে, যে কোন মৌলিক সংখ্যার চাইতে বড় একটি মৌলিক সংখ্যা পাওয়া সম্ভব, কিন্তু তাই বলে মৌলিক সংখ্যার অনন্ত সমাহারটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হল, এ কথা স্বীকার করে না)। কিছু প্রমাণ শুধুমাত্র বোধ-বাদী যুক্তির সাহায্যে সম্ভব হয় না, কিন্তু নির্মিতিবাদী গণিতের একটি সুনির্দিষ্ট সম্প্রসারিত ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যায় (সূত্র [IEP1]), যেখানে ঐ সব উপপাদ্যগুলি 'মধ্যবিকল্প-বর্জন নীতির ফলশ্রুতি' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। আসলে মধ্যবিকল্প-বর্জন অস্বীকার করা মানেই যে গণিত রসাতলে চলে গেল, তা নয় , কারণ 'সত্যতা' ব্যাপারটার কোন স্বতন্ত্র স্বীকৃতি নেই বোধ-বাদে। সত্যতা মানে আর কিছু নয়, প্রমাণ। তা হলে ত আর আলাদা করে 'সত্যতা' কথাটিরই অর্থ

থাকে না। এটি কিন্তু খুব বিপজ্জনক কিছু নয় - কারণ বোধ-বাদ সত্যতার বিকল্প যে ধারণাটির উপর জোর দেয় তা হল, 'অর্থ' (সূত্র [Bi] দ্রষ্টব্য) - আমরা যখন কোন বিবৃতির কথা ভাবি তখন তার অন্তর্গত প্রতিটি পদের অর্থ আর গোটা বিবৃতিটির অর্থ যদি আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকে, এবং তার প্রমাণ বলতে কি বোঝাই সেটিও যদি আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকে, তবে আর সত্যতা নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হয় না। কিন্তু বিবৃতিটি যদি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কিছু নিয়ে গঠিত হয় (যেমন, কোন অনন্ত সমাহারের কোন এক গুণ), বা তার প্রমাণ-প্রকরণের ভিতর যদি এমন কিছু থাকে যা অনন্ত সমাহারের বেলায় ধরে নেওয়ার কোন নিরপেক্ষ কারণ নেই (যেমন মধ্য-বিকল্প বর্জন - এটির গ্রহণযোগ্যতা সসীম সমাহারের বেলায় অবশ্যই প্রশ্নাতীত, কিন্তু শুধু সেই নিরীখে অনন্ত সমাহারের বেলায়ও এটি খাটবে, এটা ধরার যুক্তি কোথায়?) তখন ত তার অর্থ নিয়েই প্রশ্ন উঠে যেতে পারে, এবং তখন অবশ্যই ভিন্ন কোন নিরীখে সেটির 'সত্যতা' বলে স্বতন্ত্র কিছু একটা নিয়ে চর্চার কথা এসে পড়বে, যেমন এসে পড়ে চিরায়ত গণিতে। 'পৃথিবীটা খুব সুন্দর' - একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, এ কথার সত্যতা বা অসত্যতা কোন কিছুই অর্থবহ নয়, এর পদগুলি স্বতন্ত্রভাবে অর্থবহ হলেও গোটা বিবৃতিটির কোন নির্দিষ্ট অর্থই নেই (এক এক জনের কাছে এটি এক একটি ভিন্ন অর্থ বহন করে), এবং নেই বলেই এর সত্যতা নিয়ে কোন আলোচনাই চলতে পারে না। তাই চিরায়ত গণিতে যেখানে বিবৃতির 'অর্থ' নিয়ে আলাদা করে মাথা ঘামানো হয় না ('অর্থ' সেখানে শুধুমাত্র পদবিন্যাসের প্রশ্ন), সেখানে সত্যতা আর যাথার্থ্য দুটির ভিতর ব্যবধান বিস্তর । বোধ-বাদী গণিত কিন্তু সর্বদাই 'অর্থ' ব্যাপারটা নিয়ে একটা পরিষ্কার জায়গায় থাকতে চায়, আর তাই তা চায় যৌক্তিক নীতিগুলিকে ও প্রারম্ভিক স্বীকৃতিগুলিকে যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট ও বোধগম্য করে নিতে (মধ্যবিকল্প-বর্জনের নীতিকে স্বীকার না করা এই প্রয়াসেরই এক অন্যতম ফলশ্রুতি) - সেখানে তাই সত্যতার ধারণাটি, বস্তুত, বাহুল্য ছাড়া আর কিছুই নয় ।

আগেই বলেছি, বোধবাদ গোড়ায় গাণিতিকদের ভিতর খুব একটা সাড়া জাগায় নি। তবে ক্রমশ বোধ-বাদী তথা নির্মিতিবাদী গণিত নিজের জায়গা অনেকটাই পাকা করে নিয়েছে। বিশেষত, যন্ত্রগণকের সহায়তায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতের বহুবিধ সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট এক প্রস্থ নির্দেশ-ছক (algorithm) অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত এক বা একাধিক সংখ্যামান নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে নির্মিতিবাদী গণিতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এরেট বিশপ (1928-1983) দেখিয়েছেন, সংখ্যামানের বিচারে নির্মিতিবাদী গণিতের কাঠামোর ভিতর চিরায়ত গণিতের অন্তর্বস্তুর এক গরিষ্ঠ অংশকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব এবং, বস্তুত, নির্মিতিবাদী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী বৈশ্লেষিক গণিতের পুনর্নির্মাণ

সম্ভব। বিশপের নির্মিতিবাদী গণিতের মূল শর্ত হল, প্রতিটি উপপাদ্য বা বিবৃতিরই শেষ বিচারে সংখ্যামান-ভিত্তিক অর্থ থাকতে হবে।

নির্মিতি-বাদী গণিতের গোড়ার কথা, এর কয়েকটি প্রকারভেদ, এর সঙ্গে বোধ-বাদী দর্শনের সম্পর্ক, আর চিরায়ত গণিতের সাপেক্ষে নির্মিতিবাদী গণিতের বিশ্লেষণ আলোচিত হয়েছে [IEP1] নিবন্ধে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গণিত-চর্চার ভিতরই বিভিন্ন ধারার অস্তিত্ব সম্ভব, যদিও বিভিন্নতা সত্ত্বেও এগুলির প্রতিটির ভিতরই কিন্তু গণিতের সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান যার দরুন গণিত আর সব শাস্ত্র থেকে স্বতন্ত্র - গাণিতিক উপপাদ্যগুলি সর্বদাই অলঙ্ঘ্য, এগুলির প্রমাণে যদি কোন ভুল না থাকে তবে এদের কোন ব্যত্যয় নেই।

তবে 'ব্যত্যয় নেই' এই কথাটি কিন্তু ঠিকমত বোঝা দরকার, না হলে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। গণিত-চর্চার অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে দুই গাণিতিক দুই ভিন্ন ধারার গণিত-দর্শনে বিশ্বাসী হতেই পারেন, তাঁরা ভিন্ন দুই প্রস্থ যৌক্তক নীতি অনুসরণ করতেও পারেন, তাঁরা ZFC সমাহার তত্ত্বের চাইতে কিছুটা ভিন্ন এক প্রস্থ প্রারম্ভিক স্বীকৃতি ধরেও এগোতে পারেন, কিন্তু এঁদের দু জনের ভিতর একটি বিষয়ে মিল অবশ্যই থাকবে - দুজনেরই যৌক্তিক নীতি ও প্রারম্ভিক স্বীকৃতিগুলি সুনির্দিষ্ট হবে - সেখানে কোন ফাঁক বা অস্বচ্ছতা থাকলে চলবে না, কারণ তখন আর তাঁদের অনুসৃত প্রমাণ-প্রকরণ নির্বিকল্প থাকবে না, তখন আর তা গণিত পদবাচ্য হবে না। অর্থাৎ, দুজনের গণিত-চর্চায় ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু উভয়ের বেলায়ই তা হতে হবে অলঙ্ঘ্য ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ। এক কথায়, দুজনের গণিত-চর্চাই ব্যত্যয়-বিহীন, কিন্তু তবু তারা ভিন্ন, এটা হতে বাধা নেই, কারণ তারা গড়ে উঠেছ ভিন্ন নীতি ও স্বীকৃতি অবলম্বন করে (এঁদের ভিতর একজন যদি জানেন, অপর জন কী কী স্বীকৃতি ও যৌক্তিক নীতির ভিত্তিতে কোন এক বিবৃতির প্রমাণ দিয়েছেন তবে তিনি সেই প্রমাণটি দেখে নির্দ্বিধায় বলে দিতে পারবেন সেটি দ্বিতীয় জনের গণিতের নিরীখে ঠিক না ভুল)। তবে হ্যাঁ, ভিন্নতা সত্ত্বেও গণিত কিন্তু গণিতই, কারণ উপরোক্ত দুটি ধারা নামে ভিন্ন হলেও, বাস্তবে তাদের ভিতর মিলও কম নয়, যেহেতু তারা বিকশিত হয়েছে পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে। দীর্ঘ দিন ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা গণিতের যে কাঠামোটিকে অবলম্বন করে নিয়োজিত তাদের প্রয়াস ও চর্চা, সেটি উভয়ের ক্ষেত্রে একই। উভয়েরই লক্ষ্য

একই ধরনের উপপাদন প্রক্রিয়া, কেবল তাদের মাল-মশলা কিছুটা ভিন্ন, আর গাণিতিক বিবৃতিগুলির ব্যাখ্যা কিছুটা ভিন্ন। গণিতের একটিই বিশাল স্থাপত্যের ভিতর তাদের উদ্ভব এবং তাদের জীবন-চক্র । ভিন্নতা সত্ত্বেও গণিতের অনন্ত-বিস্তৃত স্থাপত্যের ভিতর তাদের অবস্থান - এই স্থাপত্যের ভিতর জায়গা পায় দুটিতেই, কারণ নিজের নিজের চর্চার ক্ষেত্রে তারা উভয়েই আপোষহীন - দুটি ক্ষেত্রেই গাণিতিক উপপাদ্যগুলি অমোঘ, ব্যত্যয়বিহীন, ব্যক্তিনিরপেক্ষ ।

বোধবাদী গণিত ও চিরায়ত গণিতের ভিতর সম্পর্কও এর চাইতে স্বতন্ত্র কিছু নয়। তবু বিংশ শতকের গোড়ার কয়েক দশক সময়কাল ধরে এদেরকে পরস্পর-ব্যতিরেকী বলে ভাবা হত, কারণ এদের দার্শনিক প্রেক্ষাপট অনেকটা ভিন্ন, আর মধ্যবিকল্প-বর্জন বিষয়ে এ দুটির অবস্থান আপাতদৃষ্টিতে সত্যিই পরস্পর-ব্যতিরেকী। তবে এ বিষয়েও কিছু বলার আছে । আগেই বলেছি, সসীম সমাহারের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিকল্প বর্জন নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই - মধ্যবিকল্পের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হোক চাই না হোক, কিছু যায় আসে না। পূর্ণসংখ্যার সমাহারের মত যে সব সমাহারের সদস্যগুলিকে এক, দুই, করে গোণা যায়, সে ক্ষেত্রেও সামান্য পার্থক্য শুধু ব্যাখ্যায় (মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কিত ইউক্লিডের প্রমাণের বেলায় যেমন) - আসল পার্থক্য যদি কিছু থাকে তবে তা আরো বেশি ব্যাপ্তিমান বিশিষ্ট সমাহারের (যেমন, সরল সংখ্যাগুলির সমাহার) বেলায়। তবে সে ক্ষেত্রেও সমস্যা ঠিক কতটা তা নিয়ে ভাবার জায়গা আছে - অন্তত, একেবারে প্রথমেই হাল ছেড়ে বসে থাকার মত নয় তা । হাল ছাড়েন নি গাণিতিকরাও। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব, বোধ-বাদী গণিত আর চিরায়ত গণিতের ভিতর সম্পর্ক শুধুই সংঘাতের, এ কথা ভাবার কারণ নেই।

এখানে একবার একটু থেমে এই নিবন্ধের প্রথম পর্বের সারসংক্ষেপ করে নেওয়া যাক।

গণিত-দর্শন- প্রথম পর্ব- সারসংক্ষেপ ।।

গটলোব ফ্রেইগে গণিতকে ধরতে চেয়েছিলেন বিশুদ্ধ যুক্তির পটভূমিতে, এবং এই প্রকল্প রূপায়নের পথে গড়ে তুলেছিলেন আধুনিক যুক্তিশাস্ত্রের কাঠামোটিকে। তিনি শুরু করেছিলেন প্রকৃত সংখ্যাগুলির গাণিতিক তত্ত্ব থেকে, এবং সফল ভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর প্রকল্পের এই প্রথম পর্বটি, কিন্তু তার পর রাসেল দেখালেন, ফ্রেইগের যৌক্তিক কাঠামোটি নিশ্ছিদ্র নয়। তাঁর (ফ্রেইগের) যৌক্তিক তত্ত্বের অন্যতম দুই উপাদান ছিল 'ধারণা' ও তার 'বিস্তারক্ষেত্র', কিন্তু 'বিস্তারক্ষেত্র' বিষয়টি ধরে দেখা দিল সমস্যা, কারণ 'বিস্তারক্ষেত্র' নিজেই একটি ধারণা - তার বিস্তারক্ষেত্র কী হবে, ফ্রেইগে তা নিয়ে গোড়ায় বড় একটা ভাবেন নি। এই ছিদ্র দিয়েই আত্মপ্রকাশ করল রাসেলের কূট, হতোদ্যম হয়ে পড়লেন ফ্রেইগে।

ফ্রেইগের প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্ব নিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল, এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন গণিত-দর্শনের নৈয়ায়িক ধারাটিকে। তাঁর নামাঙ্কিত কূটটিকে এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্যে গড়ে তুললেন স্তর-বিভাজনের তত্ত্ব, যেখানে বিস্তারক্ষেত্র বা 'সংগ্রহ'গুলি এক একটি স্তরে বিন্যস্ত - নিম্নতম স্তরের সংগ্রহগুলির সব কটিকে নিয়ে যে প্রশস্ততর সংগ্রহ সেটি পরবর্তী স্তরের সদস্য। এইভাবে রাসেল এড়ালেন আত্ম-উল্লেখ দোষ, তবু তিনি গণিতকে বিশুদ্ধ যুক্তির খাঁচায় বেঁধে রাখতে পারেন নি, কারণ তাঁর তত্ত্বে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল অনন্ত-সংখ্যক সদস্য-বিশিষ্ট সংগ্রহের অস্তিত্ব বিষয়ক এক স্বীকৃতি, যা কোনমতেই বিশুদ্ধ যুক্তির ব্যাপার নয়।

শেষ পর্যন্ত গণিতের 'ভিত্তি' হিসেবে স্বীকৃত হল ZFC সমাহার-তত্ত্ব, যা প্রতিষ্ঠিত ছিল কয়েকটি সু-নির্বাচিত স্বীকৃতির উপর। একদিকে ZFC সমাহার-তত্ত্ব, আর অপর দিকে কিছু মূল যৌক্তিক নীতি - দেখা গেল, এই নিয়েই গড়ে তোলা যায় সমগ্র গণিত শাস্ত্রকে। কিন্তু এই শাস্ত্রের ভিতর রয়ে গেল এমন কিছু রহস্যময় উপাদান যা, এক অর্থে, ধরা-ছোঁয়ার বাইরের ব্যাপার - এ সবগুলিরই উৎস হল 'অনন্ত' সম্পর্কে গাণিতিক ধারণা। অণুসম এবং অনন্ত - এই দুই বিষয় নিয়ে গাণিতিকেরা ভাবিত ছিলেন বহু দিন ধরেই। কোশী ও ভায়াস্ট্রাসের অবদানের সূত্রে বৈশ্লেষিক গণিতের ভিৎ শক্ত হওয়ার পাশাপাশি ডেডিকিন্ড ও কান্টরের হাতে সরল সংখ্যার তত্ত্ব ও সমাহার তত্ত্বের কাঠামো গড়ে ওঠার পর গণিতের 'মূলতত্ত্ব' নিয়ে শুরু হয় চর্চা, যেখানে থাকবে না কোন অসঙ্গতি, কোন অমীমাংসিত মৌলিক প্রশ্ন। এই অনুসন্ধানের সূত্রেই তৈরী হয়েছিল ZFC সমাহার-তত্ত্ব, যার ভিতর কোন অসঙ্গতি ধরা পরে নি এখন পর্যন্ত, আর আগামী দিনেও সম্ভবত পড়বে না। কিন্ত গাণিতিকরা চান নিশ্চয়তা। কান্টর গণনাযোগ্য অনন্ত আর আ-গণনাযোগ্য অনন্তের ভিতর পার্থক্য টানলেও তাদেরকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে শুরু করেছিলেন অনন্ত সম্পর্কিত গাণিতিক চর্চার এক ধারা, যা নিয়ে রয়ে গেল সংশয়। ZFC-এর ভিতর রয়ে গেল এমন কিছু অনন্ত-আশ্রয়ী স্বীকৃতি, যা ছিল বোধগম্যতার বাইরে। গণিতে বোধগম্যতার প্রশ্নটি নিয়ে ব্রাউয়ারের হাত ধরে জন্ম নিল বোধ-বাদী দর্শনের ধারা যা তথাকথিত চিরায়ত গণিতের বিপরীতে তুলে ধরল কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন।

চিরায়ত গণিতের অন্তরালবর্তী দর্শনের প্রধান ধারাটি হল প্লেটোবাদী বা বাস্তবতাবাদী দর্শন, যদিও এই 'বাস্তবতাবাদ' নামকরণটির ভিতর রয়ে গেছে একটু বৈপরীত্যের ছোঁয়া, কারণ এই দর্শন বলে যে গাণিতিক বিবৃতিগুলি অবস্থিত

এমন এক লোকোত্তর জগতে যা আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যার নাগাল আমরা পাই এক অনির্বচনীয় ‘অন্তর্দৃষ্টি’ সহযোগে। এই চিন্তাধারারই প্রতিক্রিয়ায় এল বোধবাদী দর্শন, বোধবাদী যুক্তিশাস্ত্র, আর বোধবাদী তথা নির্মিতিবাদী গণিত। চিরায়ত গণিতের একটি মূল যৌক্তিক নীতি হল মধ্য-বিকল্প বর্জন, বোধবাদী যুক্তিশাস্ত্র যা স্বীকার করে না, কারণ অ-গণনাযোগ্য সমাহারের বেলায় মধ্য-বিকল্প বর্জনের নীতিটি বোধগম্য নয়। বোধবাদী দর্শনের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে নির্মিতিবাদি গণিত, যা মনে করে, কোন গাণিতিক বিবৃতির সত্যতার অভিজ্ঞান হল সেটির সঠিক প্রমাণ - প্রমাণ, অর্থাৎ যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠার অতীত কোন সত্যতা নেই। বিপরীতে চিরায়ত গণিত কিন্তু বলে, সত্যতা আর যাথার্থ্য এক কথা নয়। কোন গাণিতিক বিবৃতির প্রমাণ সাধিত হয় যুক্তির এক শৃঙ্খল অনুসরণ করে, আর তার সত্যতা নির্ধারিত হয় ভিন্ন এক প্রস্থ নিয়ামক দ্বারা - সত্যতা, প্রমাণের উপর নির্ভর করে না। প্লেটো-বাদী দর্শন বলে, সত্যতা এক লোকোত্তর জগতের ব্যাপার - গাণিতিকের কাজ হল সত্যকে আবিষ্কার করা, উদ্ভাবন করা নয়। বস্তুত, এমন সত্য সম্ভব যা প্রমাণযোগ্য নয়। গোয়েডেলের উপপাদ্যগুলির ভিতর একটির মর্মবস্তু ছিল এ রকমই।

তবে চিরায়ত গণিত আর বোধ-বাদী গণিত আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর-ব্যতিরেকী হলেও, উভয়ের ভিতর নেই কোন সংঘাত - গণিতের অনন্ত-বিস্তৃত ক্ষেত্রটির ভিতর স্থান পেয়েছে উভয়েই। দুটির ভিতর প্ররম্ভিক স্বীকৃতিতে ও যৌক্তিক নীতিতে পার্থক্য থাকলেও, উভয়েরই প্রমাণ-প্রকরণ নিশ্ছিদ্র, উভয়েরই অন্তর্গত বিবৃতিগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও অলঙ্ঘ্য - বোধবাদীকে যদি চিরায়ত গণিতের কোন প্রমাণ পরীক্ষা করতে দেওয়া হয় তবে তিনি নির্দ্বিধায় বলে দিতে পারবেন সেটি চিরায়ত গণিতের নিরীখে গ্রহণযোগ্য কি না, আবার চিরায়ত গণিতের সমর্থকও একই ধরনের রায় দিতে দ্বিধা করবেন না। তবে চিরায়ত গণিতের কিছু বিবৃতি বোধবাদীর কাছে অর্থহীন, কিছু বিবৃতি গ্রহণযোগ্য হলেও সেগুলির ব্যাখ্যা ভিন্ন । গণিত নামক বৌদ্ধিক চর্চাটির অবয়ব নির্বিকল্প নয়। তবে দুটি স্বতন্ত্র অবয়বের ভিতর ভিন্নতার তুলনায় মিলের দিকই বেশি।

দ্বিতীয় পর্ব ।।

এক ।।

ডেভিড হিলবার্ট সীমা-নিবদ্ধ গণিত ।।

ডেভিড হিলবার্ট (1862-1943) গণিতের এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। তিনি গণিত-দর্শনের যে ধারাটির সমর্থক ছিলেন তাকে আঙ্গিক-বাদ বা formalism নামে অভিহিত করা হয়, তবে শুধু গণিত-দর্শন নয়, গণিত-চর্চায়ও হিলবার্ট ও তাঁর সতীর্থরা একটি বিশেষ ব্যাপারের উপর জোর দিয়েছিলেন, যার নাম আমরা দেব ‘সীমা-নিবদ্ধ’ গণিত (finitary mathematics)। ‘আঙ্গিক-বাদ’

নামকরণটি এই কারণে যে হিলবার্ট গণিতের নীতি বা বিবৃতিগুলিকে দেখেছিলেন শুধু কিছু সংকেতচিহ্নের নানান বিন্যাস রূপে, বিন্যাসের বাইরে তাদের কোন স্বতন্ত্র অর্থের কথা না ভেবে। আর 'সীমা-নিবদ্ধ' গণিত এই কারণে যে, গাণিতিক প্রমাণ-প্রকরণকে তিনি নির্দিষ্টতা দিতে চেয়েছিলেন সসীম মাত্রার নানান প্রক্রিয়ার বাইরে কোন কিছু ভাবার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অর্থাৎ, তারঁ মতে, গাণিতিক জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) ব্যাপারটা নিয়ে কোন ধোঁয়াশা রাখা ঠিক নয় - আমরা গাণিতিক সত্যের সন্ধান পাই যে প্রক্রিয়ায় সেটি একান্ত ভাবে বোধ-নির্ভর, অর্থাৎ অলৌকিক বা অসীম কিছু নয়, তাই গাণিতিক প্রমাণ সর্বদাই একটা সসীম বস্তু। গণিতের নানান বিষয়ে ব্যবহৃত সংকেতচিহ্নগুলি সম্পর্কে এবং তাদের নানান মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক জ্ঞান উদ্ভূত হয় এক ধরনের আদি-বোধ বা অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায়, আর তার পর সসীম মাত্রার প্রমাণ-প্রকরণ প্রয়োগ করে আমরা এক এক করে পৌঁছে যাই গাণিতিক বিবৃতিগুলিতে। গণিত বস্তুত দাবা খেলার মত একটা ব্যাপার - দাবার গুঁটিগুলি নেহাতই কিছু সংকেত, যাদের ভিতর আমরা কোন গভীরতর অর্থ খুঁজতে যাই না, আর যাদের চালগুলি বোঝা যায় সসীম একগুচ্ছ নির্দেশের মাধ্যমে - এবারে পর পর চালের মাধ্যমে এগিয়ে চলে দাবার খেলা।

তবে হিলবার্ট সসীমের পূজারী হয়েও চিরায়ত গণিতের উপপাদ্যগুলিকে ছাড়তে চান নি। তাঁর বক্তব্য অনেকটা এরকম - গণিতের বিবৃতি ও উপপাদ্যগুলির ভিতর অনন্ত থাকুক চাই না থাকুক, সেই অনন্ত 'বোধগম্য' হোক চাই না হোক, সেগুলি অভিধা-বিপর্যয়ী হোক চাই না হোক, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই, কারণ সেগুলিকে যখন বিবৃত করা হয় তখন ত তারা কিছু সংকেত-চিহ্নের সমাহার, তাদের 'অর্থ' বা 'বোধগম্যতা' নিয়ে ভাবার কোন স্বতন্ত্র তাৎপর্য নেই - শুধু দেখতে হবে, সসীম প্রমাণ-প্রকরণের সাহায্যে সেগুলিতে আমরা পৌঁছতে পারছি কি না।

তবে হ্যাঁ, একটা বিষয় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, এই প্রমাণ-প্রকরণ প্রয়োগ করে আমরা যে সব বিবৃতিতে পৌঁছচ্ছি সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না, অর্থাৎ, গণিতের ভিতর *অসঙ্গতি* বা স্ববিরোধ যেন ঢুকে না পড়ে। অথচ, সঙ্গতি-অসঙ্গতির ব্যাপারটা কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে হিলবার্টের দর্শনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, কারণ দুটি বিবৃতির ভিতর বিরোধ আছে কি নেই সেটা ত বোঝা যাবে তাদের অর্থ বিচার করে - হিলবার্ট ত অর্থ ব্যাপারটা আদতেই মানতে রাজি নন। এখানে

হিলবার্ট তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগ করে একটা বড় রকমের চাল চাললেন। কোন গাণিতিক তন্ত্রের ভিতর যদি স্ববিরোধ থাকে তবে তা থেকে কোন না কোন ভাবে প্রমাণপ্রকরণের পথ ধরে ঐ তন্ত্রের ভাষায় প্রকাশযোগ্য যে কোন এক জোড়া পরস্পর-বিরোধী বিবৃতিতে পৌঁছন যায়, যেমন, '1≠2[and]1=2', যেখানে 'and' হল একটি যৌক্তিক সংযোজক। স্পষ্টতই, এটি একটি স্ব-বিরোধী বিবৃতি, অবশ্য যদি আমরা অর্থ বিচার করি তবেই । গাণিতিক তন্ত্রটি যদি সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তবে প্রমাণের কোন না কোন পথ ধরে আমরা এই যৌগ বিবৃতিটিতে পৌঁছতে পারবই। আবার, আর এক দিক থেকে দেখলে এটি কয়েকটি সংকেতচিহ্নের একটি বিশেষ বিন্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তা হলে শব্দার্থের কথা না ভেবে আমাদের দেখতে হবে, এই বিশেষ বিন্যাসটিতে আমরা পৌঁছতে পারছি কি না - যদি পারি তবে বুঝতে হবে, গাণিতিক তন্ত্রটি অসঙ্গতিপূর্ণ।

দুই ।।

হিলবার্টের 'প্রকল্প' ।।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে গাণিতিকদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে হিলবার্ট তখনকার গণিতের কয়েকটি অমীমাংসিত সমস্যার তালিকা তুলে ধরেন , এবং পরে আরো কয়েকটি সমস্যাকে তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। হিলবার্টের এই তালিকাটি বহুসংখ্যক গাণিতিককে কর্মচঞ্চল করে তোলে কারণ অনেকেই মনে করেছিলেন এই সমস্যাগুলির মীমাংসা হলে গণিতের গোটা স্থাপত্যটি দৃঢ় ও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে । হিলবার্ট মনে করতেন কোন গাণিতিক সমস্যার সমাধান হয় আছে, নয় ত নেই। কোন সমস্যা যে অমীমাংসেয় হতে পারে, তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। মনে রাখতে হবে, হিলবার্ট কিন্তু চিরায়ত গণিতের বিবৃতি ও উপপাদ্যগুলিকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন, কেবল সেগুলির অর্থ নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিল ভিন্ন। তিনি মনে করতেন, চিরায়ত গণিতের সমস্ত উপপাদ্যেই আমরা সসীম প্রমাণপ্রকরণের মাধ্যমে পৌঁছতে পারব - শুধু এটুকু দেখতে হবে যে সেই গণিতের ভিতর কোন স্ববিরোধ যেন না থাকে।

তাই, হিলবার্ট তাঁর তালিকার ভিতর একটিতে প্রশ্ন রেখেছিলেন, পাটিগণিত শাস্ত্রটি কি স্ববিরোধ-মুক্ত ?

আগেই উল্লেখ করেছি, প্রকৃত সংখ্যাগুলির বিষয়ে যাবতীয় বিবৃতি ও উপপাদ্যের ভিত্তি হল 'পেয়ানোর স্বীকৃতি' (Peano axioms) নামক এক গুচ্ছ স্বীকৃতি বা স্বতঃসিদ্ধ, যেগুলির তালিকা রচনা করেন ইতালীয় গাণিতিক পেয়ানো (1858-1932), যদিও ডেডিকিন্ডও স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃতিগুলির কথা ভেবেছিলেন। এই স্বীকৃতিগুলি থেকে শুরু করে, এবং প্রথম-বর্গীয় যুক্তিশাস্ত্রের যৌক্তিক নীতিগুলি কাজে লাগিয়ে গড়ে তোলা যায় সমগ্র পাটিগণিত শাস্ত্র। অবশ্য ZFC-এর স্বীকৃতিগুলি থেকে শুরু করে এবং ঐ একই যৌক্তিক নীতি প্রয়োগ করে পেয়ানোর স্বীকৃতিগুলিকে প্রমাণ করা যায় (আগেই বলেছি, গাণিতিকরা এই প্রমাণ রচনা করেছেন ফ্রেইগের দেখান পথ অবলম্বন করে)।

তবে এই প্রশ্নটির তাৎপর্য ছিল তাঁর তালিকার অন্যান্য প্রশ্নগুলির তুলনায় ভিন্ন । গণিতের ভিতর চিরায়ত গণিত আর বোধবাদী গণিত, এই দুই ভিন্ন ধারার অস্তিত্ব একটু বেখাপ্পা ব্যাপার, বিশেষত সে দুটির দার্শনিক প্রেক্ষাপট যখন এতটাই ভিন্ন - প্রায় প্রস্পর-ব্যতিরেকী। হিলবার্ট চাইছিলেন এ বিষয়ে একটা পাকাপাকি মীমাংসার জায়গায় পৌঁছতে। হিলবার্ট-সমর্থিত সীমা-নিবদ্ধ গণিত, যার উৎস-মুখ হল গণিত-দর্শনের আঙ্গিকীয় ধারা (formalism), তাকে বোধবাদ কোনদিনই ভাল চোখে দেখে নি। ব্রাউয়ার নিজে হিলবার্টের গণিত-দর্শনকে মেনে নেন নি, কারণ আঙ্গিকীয় দর্শন গণিতের ধারণাগুলির অর্থ বা তাৎপর্য বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন - যা বস্তুত বোধবাদী চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব। হিলবার্ট যে 'প্রকল্প'টি গ্রহণ করেছিলেন তা হল, দার্শনিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও গাণিতিক চর্চার ভিতরে ঢুকে কি দেখান যায় যে চিরায়ত গণিত আর বোধবাদী গণিতের ভিতর একটা সাযুজ্যের জায়গা রয়েছে (কী অর্থে সাযুজ্য, সে কথায় আসছি)? কারণ, আগেই বলেছি, হিলবার্ট চিরায়ত গণিতের উপপাদ্যগুলিকে বর্জনযোগ্য মনে করতেন না ।

হিলবার্ট যে সীমা-নিবদ্ধ প্রমাণ-প্রকরণের উপর জোর দিয়েছিলেন, মূলত সেটিই আধুনিক গণিত-শাস্ত্রে উপপাদন তত্ত্ব (proof theory)রূপে স্বীকৃত হয়েছে। গণিতের কোন প্রমাণকে উপপাদন তত্ত্ব অনুযায়ী পরীক্ষা করে বলা যেতে পারে, প্রমাণটি ঠিক না ভুল, অথবা সেটিতে কোন বিধি-বহির্ভূত পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে কি না । ফলত, উপপাদন তত্ত্বের বিচার একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার, যাকে বলা যেতে পারে 'গণিতোত্তর' (metamathematical) বিচার।

চিরায়ত গণিতের জটিল ও প্রায়-রহস্যময় শাস্ত্রটির ভিতর যদি আপত্তিজনক কিছু থাকেও তবু, বোধবাদী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী যে সব বিবৃতি সঠিক সেগুলিকে যদি চিরায়ত গণিত ঠিকমত প্রমাণ করতে পারে, এবং বোধবাদী দৃষ্টিতে যা স্ববিরোধী তেমন কোন বিবৃতি যদি চিরায়ত গণিতের উপপাদ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে চিরায়ত গণিত নিয়ে বোধবাদের কোন আপত্তি থাকার কথা নয় । কারণ সেক্ষেত্রে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে চিরায়ত গণিতের ভিতর আর কিছু না হোক, অন্তত বোধবাদের নিজস্ব এলাকাটি অবিকৃত রূপে সংরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে হিলবার্টের সীমা-নিবদ্ধ গণিতের চিন্তাধারা বোধবাদী চিন্তাধারার তুলনায় ভিন্ন। হিলবার্টের প্রকল্প ঠিক সরাসরি বোধবাদী গণিতের এলাকাটিকে সংরক্ষিত করতে চায় নি, চেয়েছিল চিরায়ত গণিতের ভিতর সীমা-নিবদ্ধ গণিতের এলাকাটিকে সংরক্ষিত করতে। এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্তটি গাণিতিকদের পথ দেখাল তা হল, চিরায়ত গণিত স্ববিরোধ-মুক্ত, এই বক্তব্যটিকে যদি সীমা-নিবদ্ধ প্রমাণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে এটাও প্রতিষ্ঠিত হবে যে চিরায়ত গণিতের ভিতর সীমা-নিবদ্ধ গণিতের নিজস্ব এলাকাটি অবিকৃত রূপে সংরক্ষিত - সীমা-নিবদ্ধ গণিতের কোন বিবৃতি যদি চিরায়ত গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় তবে সেটিকে সীমা-নিবদ্ধ গণিতের প্রমাণ-পদ্ধতি অনুসরণ করেও প্রতিষ্ঠা করা যাবে। হয়ত সেটি করতে হলে একটু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে, হয়ত চিরায়ত গণিতের প্রমাণের মত সেটি যাদুকরের খেলার মত আশ্চর্যজনক হবে না, তবু শেষ পর্যন্ত এ কথা বলা যাবে যে সীমা-নিবদ্ধ গণিতের কোন বিবৃতি যদি চিরায়ত গণিতের সহায়তায় প্রমাণযোগ্য হয়, তবে চিরায়ত গণিতের উদার সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র সীমা -নিবদ্ধ গণিতের এলাকার ভিতরই সেটির প্রমাণ সম্ভব হবে।

আর, সীমা-নিবদ্ধ গণিতের প্রমাণ-প্রকরণ বোধবাদীর কাছে গ্রহণযোগ্য। তাই, চিরায়ত গণিত স্ববিরোধ-মুক্ত, এই বক্তব্যটি যদি সীমা-নিবদ্ধ প্রমাণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে বোধ-বাদ এ কথা স্বীকার করবে যে চিরায়ত গণিতের ভিতর কোন বিপদ লুকিয়ে নেই , চিরায়ত গণিত অনন্ত-বাদী হলেও অন্তত সীমা-নিবদ্ধ গণিতের এলাকাটিকে সে বিপর্যস্ত করে না, সীমা-নিবদ্ধ গণিতের নিয়মতন্ত্রে যা যথার্থ নয় এমন কোন বিবৃতিকে চিরায়ত গণিতের পথ অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। হিলবার্টের প্রকল্প এভাবেই চিরায়ত গণিতকে বোধবাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছিল। এই ভাবনার যৌক্তিকতা কতটা তা নিয়ে সংশয় থাকতেই

পারে, তবে হিলবার্টের প্রকল্প গাণিতিকদের মনে একটা আশা জাগিয়েছিল, হয়ত এর মাধ্যমে চিরায়ত গণিত আর বোধবাদী গণিতের ভিতর একটা মীমাংসার পথ পাওয়া যাবে।

হিলবার্টের প্রশ্নের তালিকায় যে প্রশ্নটিতে, গণিত স্ববিরোধ-মুক্ত কি না তার একটি সীমা-নিবদ্ধ প্রমাণ চেয়েছিলেন হিলবার্ট, সেই পশ্নের সমাধান খুঁজতে তৎপর হয়েছিলেন কার্ট গোয়েডেল । আর, এ কাজে নেমে একের পর এক চমকপ্রদ কয়েকটি উপপাদ্য গণিতের জগৎকে উপহার দিলেন গোয়েডেল। তার ভিতর ছিল, 'প্রথম' ও 'দ্বিতীয়' অসম্পূর্ণতার উপপাদ্য। প্রথম অসম্পূর্ণতার উপপাদ্যটির বক্তব্য ছিল এ রকম: কোন গাণিতিক তন্ত্র যদি যথেষ্ট প্রশস্ত হয় (এখানে 'প্রশস্ত' কথাটির ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না) এবং সেটি যদি স্ববিরোধ-মুক্ত হয় তবে সেটি একই সঙ্গে অসম্পূর্ণও হবে, অর্থাৎ সেই তন্ত্রের ভিতর যে সব বিবৃতি সত্যতা গুণসম্পন্ন তার সবগুলি প্রমাণযোগ্য হবে না । এক কথায়, গোয়েডেল চিরায়ত গণিতের সেই গুরুতর সমস্যাটিকে গাণিতিক বৈদগ্ধ্যে জগতের সম্মুখে হাজির করলেন যার মীমাংসা শুধু গণিতে নয়, দর্শনেও সুদূরপরাহত - সত্যতা আর যাথার্থ্য (অর্থাৎ প্রমাণযোগ্যতা) এক নয়, এদের ভিতর রয়েছে এক দুস্তর ব্যবধান। বোধবাদের বক্তব্য, গণিতের সীমানার ভিতর এই ব্যবধান থাকা উচিৎ নয়, যাথার্থ্যের অতীত কোন সত্যতার অস্তিত্ব মেনে নিলে গণিত হারাবে তার সর্বজনীনতা ও নির্দিষ্টতা । এ বিষয়ে হিলবার্টের মতও ছিল বোধবাদীদের অনুরূপ - এমন কোন সত্য নেই যা আমরা জানতে পারব না (অর্থাৎ প্রমাণের পথ ধরে সেই সত্যে পৌঁছতে পারব না), এ কথা তিনি মানতে রাজী ছিলেন না । তাই, গোয়েডেলের প্রথম অসম্পূর্ণতার উপপাদ্য হিলবার্টের গাণিতিক ভাবনায় একটা আঘাত হেনেছিল, যদিও চিরায়ত গণিত আর বোধবাদী গণিতের ভিতর একটা মীমাংসায় পৌঁছনর যে প্রকল্প, তাতে এটির কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না । বস্তুত, প্রথম উপপাদ্যের ফলশ্রুতি হিসেবে একটা বিষয় গাণিতিকদের কাছে পরিষ্কার হয়েছিল, সীমা-নিবদ্ধ পদ্ধতিতে চিরায়ত গণিতকে স্ববিরোধিতা-মুক্ত প্রমাণ করলে, তাতে যদি বা এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে সীমা-নিবদ্ধ গণিতের নিজস্ব এলাকাটিকে চিরায়ত গণিত বিপর্যস্ত করে না, তবু এটা কিন্তু বলা যায় না যে বোধবাদী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী যা যথার্থ নয় সে রকম কোন বিবৃতির প্রতি চিরায়ত গণিত কখনই সমর্থন যোগাবে না; অর্থাৎ, চিরায়ত গণিত অনুসরণ করে এগোলে এমন কোন বিবৃতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যা বোধবাদী গণিত অনুযায়ী সমর্থনযোগ্য নয় - এক কথায়, দুইয়ের ভিতর মীমাংসায় পৌঁছনর ব্যাপারে প্রথম উপপাদ্যটি কোন নির্দিষ্ট পথ দেখাতে পারল না (হিলবার্টের প্রকল্প বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, সূত্র [GV] ষষ্ঠ অধ্যায়)।

‘মীমাংসা’ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে সেটি পরিষ্কার হওয়া দরকার। দুটি সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখতে হবে। এক, চিরায়ত গণিত বোধবাদী গণিতের যাথার্থ্যের ধারণাটিকে বিপর্যস্ত করে না, চিরায়ত গণিতের পথ অনুসরণ করে এমন কোন বিবৃতি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না , যা বোধবাদী গণিত অনুযায়ী যথার্থ নয় । এটা এক ধরনের ইতিবাচক মীমাংসা, কারণ সে ক্ষেত্রে চিরায়ত গণিত সম্পর্কে বোধবাদী গণিতের যে সংশয়, তা অপনীত হবে। আর, দুই, চিরায়ত গণিত বোধবাদের বিরোধী এক শাস্ত্র - বোধবাদ যে সব বিবৃতিকে প্রমাণের অযোগ্য মনে করে চিরায়ত গণিত তার অনন্ত -আশ্রয়ী চিন্তা-ভাবনার দৌলতে সেগুলির প্রতি সমর্থন যোগায়। এই দুইয়ের ভিতর কোন একটি যদি সংশয়াতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেটিকে মীমাংসা বলা যাবে - একটি হল ইতিবাচক মীমাংসা, অপরটি নেতিবাচক। হিলবার্ট চেয়েছিলেন ইতিবাচক মীমাংসা, তিনি চেয়েছিলেন যাতে বোধবাদীরা স্বীকার করে যে চিরায়ত গণিত তাদের (বোধবাদীদের) যাথার্থ্যের ধারণাটিকে কখনই বিপর্যস্ত করবে না।

প্রথম উপপাদ্যটি থেকে শুধু এটুকু বোঝা গিয়েছিল যে চিরায়ত গণিত সীমা-নিবদ্ধ গণিতের যাথার্থ্যের ধারণাটিকে যদি বা রক্ষা করে তবু কিন্তু তা বোধবাদী গণিতের যাথার্থ্যের ধারণাকে রক্ষা করবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে অসম্পূর্ণতার দ্বিতীয় উপপাদ্যটির প্রভাব ছিল অনেকটাই নেতিবাচক ।

অসম্পূর্ণতার দ্বিতীয় উপপাদ্য: যথেষ্ট প্রশস্ত কোন গাণিতিক তন্ত্র যদি স্ববিরোধ-মুক্ত হয়ও তবু সেই তন্ত্রের ভিতরকার প্রমাণ-প্রকরণ অনুসরণ করে এটা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না যে সেটি আসলে স্ববিরোধ-মুক্ত । হিলবার্টের প্রকল্পের ব্যাপারে এই উপপাদ্যটি স্বভাবতই বেশ সমস্যার কারণ , যেহেতু প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল সীমা-নিবদ্ধ পথে চিরায়ত গণিতকে স্ববিরোধ-মুক্ত প্রমাণ করা। অর্থাৎ হিলবার্ট যে ‘মীমাংসার’ কথা ভেবেছিলেন তা হয়ে রইল অনেকটাই সুদূরপরাহত ।

চিরায়ত গণিত বনাম বোধবাদী গণিত - এই প্রসঙ্গটিই আমার এই নিবন্ধের একটা মূল আলোচ্য বিষয়, কারণ এই সূত্র ধরেই আমরা বুঝতে চেষ্টা করব , মানুষের বোধ, বুদ্ধি ও সংস্কৃতির জগতে গণিতের স্থান কোথায় ।

এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই এসে পড়বে আর একটি প্রশ্ন - সীমা-নিবদ্ধ গণিত আর বোধবাদী গণিতের ভিতর পার্থক্য কোথায়। উভয়েই গাণিতিক সত্য বলতে বোঝে প্রমাণযোগ্যতা, প্রমাণযোগ্যতার অতীত কোন সত্যের সম্ভাবনা এরা স্বীকার করে না। গাণিতিক সত্যের অনুসন্ধান মানুষের মনন -সঞ্জাত একটি বৌদ্ধিক ক্রিয়া - সত্যের কোন লোকোত্তর (transcendental) অস্তিত্ব এদের কেউই স্বীকার করে না; উভয়েই মনে করে, গাণিতিক সত্য মানুষের বোধগম্য, বোধগম্যতাই সত্যতার প্রকৃত অভিজ্ঞান। কিন্তু বোধগম্যতার অর্থ উভয়ের কাছে অনেকটাই ভিন্ন - সীমা-নিবদ্ধ গণিত বোধগম্যতা বলতে বোঝে, গণিতের সংকেত-চিহ্নগুলিকে অনুধাবন করা, এবং গণিতের চর্চায় তাদের ভূমিকা তথা তাৎপর্য উপলব্ধি করা, দাবার পাকা খেলোয়ার যে ভাবে দাবার গুঁটিগুলিকে চিনে নেন এবং তাদের কোনটির কি চাল সেটা বুঝে নিয়ে এবারে বুদ্ধি খাটিয়ে একের পর এক চাল দিতে থাকেন। 'খেলা'র বাইরে কোন চালেরই কোন স্বতন্ত্র 'অর্থ' নেই সীমা-নিবদ্ধ গণিতে। বিপরীতে, গণিতের যৌক্তিক ও গাণিতিক নীতিগুলির অর্থ বোধবাদীর কাছে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি মানুষের বোধজনিত - বোধ-ক্রিয়া সর্বদাই সংঘটিত হয় কোন এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে, এর প্রতিটি উপাদানেরই বিশেষ উদ্দেশ্য, তাৎপর্য, ও অর্থ রয়েছে সেই প্রেক্ষাপটের ভিতর। গণিত-চর্চায় সেই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতটি সর্বদা প্রত্যক্ষগোচর হয় না, কিন্তু সেটির অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। অনস্বীকার্য বলেই, চিরায়ত গণিতের অনন্ত-আশ্রয়ী নীতিগুলি বোধবাদীর কাছে সর্বদা গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু সীমা-নিবদ্ধ গণিতের কাছে গ্রহণযোগ্য, কারণ সীমা-নিবদ্ধ গণিতের দৃষ্টিতে এই নীতিগুলি কিছু সংকেতচিহ্নের বিন্যাস বৈ আর কিছু নয়।

তিন ।।

গণিত-দর্শন: লোকোত্তর জগৎ বনাম বোধের জগৎ।।

আগেই বলেছি, সীমা-নিবদ্ধ গণিত-দর্শন বা বোধবাদী গণিত-দর্শন উভয়েই গণিতের ধারণা ও বিবৃতিগুলির লোকোত্তর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। বিপরীতে চিরায়ত গণিত এগুলির বোধ-নিরপেক্ষ 'অস্তিত্ব'-এর কথা বলে, যদিও সে অস্তিত্ব আমাদের ধরা-ছোঁয়ার অতীত এক জগতে, যে জগতের আভাস আমরা পাই কেবলমাত্র এক বিশেষ 'অন্তর্দৃষ্টির' সহায়তায়। অর্থাৎ, চিরায়ত গণিতের দর্শন বিশ্বাস করে এক অনির্বচনীয় 'বাস্তবতা'য়, আর তাই এই দর্শন প্লেটোর বিশুদ্ধ ভাববাদের উত্তরসূরী হয়েও 'বাস্তবতা-বাদ' আখ্যা পায়। বিপরীতে, সীমা-নিবদ্ধ গণিত আর বোধবাদী গণিতের দর্শন ভূষিত হয় 'ভাব-বাদী' দর্শন আখ্যায়।

আমাদের চিরাচরিত চিন্তায় বাস্তবতা-বাদ আর ভাব-বাদ যথাক্রমে ‘প্রগতি’ আর ‘প্রতিক্রিয়া’র বাহক। বস্তুত, ব্রাউয়ার চিরায়ত গণিতের প্রতি এক ধরনের প্রতিক্রিয়ার মনোভাব থেকেই বোধ-বাদী দর্শনের পথে হেঁটেছিলেন। কিন্তু গোলমাল বাধে তখনই যখন বাস্তবতা-বাদ আর ভাব-বাদ কথা দুটিকে গণিতের ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ভিন্ন অনুষঙ্গ । যেমন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তবতা-বাদ আর ভাব-বাদ কথা দুটির তাৎপর্য ভিন্ন । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তবতা-বাদ মানুষের বোধ-নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে, আর ভাব-বাদ বলে যে ‘বাস্তব’ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন তাৎপর্যই নেই, বাস্তব জগৎ আসলে আমাদের একটা ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক সময় এই দুই ভাবনাকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ‘প্রগতি’র এবং ‘প্রতিক্রিয়া’র দ্যোতক বলে ভাবা হয়।

‘প্রগতি’ বা ‘প্রতিক্রিয়া’, এই ধরনের কথা বহুল ব্যবহারের ফলে একটু একটু করে তাদের অর্থের নির্দিষ্টতা হারিয়ে বসেছে । তা ছাড়া, এদের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্র হল রাজনীতি ও সমাজনীতি। বিজ্ঞান বা গণিত অবশ্যই রাজনীতি বা সমাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু তবু বিজ্ঞান ও গণিতে রাজনীতি বা সমাজনীতির শব্দ-বন্ধ পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। আবার, আগেই বলেছি, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তবতা-বাদ আর ভাববাদ শব্দ দুটির যে অনুষঙ্গ, গণিতে তা নয়। গণিতের বাস্তবতা-বাদ কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের অস্তিত্ব নিয়ে কোন কথা বলে না, বলে এক লোকোত্তর গাণিতিক জগৎ নিয়ে, যার কোন লৌকিক অস্তিত্বই নেই - এটি ‘বাস্তবতা’-বাদ এই কারণে যে এর দৃষ্টিতে গাণিতিক সত্যগুলি মানুষের বোধ-নিরপেক্ষ । এখন ‘বোধ-নিরপেক্ষ’ কথাটির তাৎপর্য দু’ দিক দিয়ে ভাবা যেতে পারে - এক, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ অর্থে, এবং এই দিক ধরে বিচার করলে বোধ-বাদী গণিতও কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (তা না হলে তা গণিত রূপে বিবেচ্যই হতে পারত না); আর দুই, ‘বোধ-নিরপেক্ষ’ কথাটি ব্যবহার করা যেতে পারে, মানুষের ভাবনা-চিন্তার জগতের ঊর্ধে, এই অর্থে। এখানেই প্রশ্ন ওঠে, যে চিন্তাধারা বলে যে গণিত মানুষের ভাবনা-চিন্তার জগতের ঊর্ধে, সেটিকে কি বাস্তবতা-বাদ বলা যায়, না কি সেটিই প্রকৃত অর্থে ভাব-বাদ? আসলে, কোন কিছুকে একটি কিছু আখ্যা দেওয়া বা, যাকে বলা হয়, ‘ছাপ মেরে দেওয়া’, সেটা নিয়ে আলোচনা করা একটু বিপজ্জনক, কারণ সে আলোচনায় সর্বদা নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না। আমি তাই গণিতের ক্ষেত্রে বাস্তবতা-বাদ কথাটিকে ভাব-বাদের বিপরীত অর্থে ধরব না, আর একই কারণে বোধ-বাদকে ভাব-বাদ বলেও দেখব না। বিজ্ঞান আর গণিতের ক্ষেত্রে দার্শনিক অবস্থানগুলি প্রকৃত বিচারে একটু ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে । এই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে বিজ্ঞান-দর্শন আর গণিত-দর্শনকে পাশাপাশি রেখে অল্প আলোচনার অবকাশ আমরা পাব। আবার, বিজ্ঞান আর গণিতের সম্পর্ক নিয়েও সামান্য একটু আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।

আর যাই হোক, মানুষের মনন-ক্রিয়া ছাড়া যে গণিত-চর্চা একেবারেই অসম্ভব সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। তবু যে প্লেটো-বাদী দর্শনে গণিতকে মানুষের বোধ-নিরপেক্ষ বলা হয়, তার কারণ এটাই যে গাণিতিক সত্যগুলি মনুষ্য-জাতির চেতনা বা বোধের উপর নির্ভরশীল নয়, এ রকমটাই অনেকে মনে করেন। যেমন, '2+3=5', এই বিবৃতির সত্যতা কি মনুষ্য জাতি কী ভাবল না ভাবল তার উপর নির্ভরশীল? পৃথিবী থেকে মানুষ লুপ্ত হয়ে গেলে '2+3=5' এ কথা কি মিথ্যা হয়ে যাবে ? একটি গাছের ডালে দুটি পাখী বসে আছে, আর অপর একটি ডালে তিনটি পাখী বসে আছে, তাহলে কি তখন দুটি মিলিয়ে পাখীর সংখ্যা পাঁচ না হয়ে অন্য কোন সংখ্যা হবে ? এই ধরনের যুক্তি আপাত-দৃষ্টিতে বেশ আকর্ষণীয়, কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায়, এগুলির ভিতর সারবত্তা কম। বিজ্ঞানেও বাস্তবতা-বাদের সমর্থনে অনেক সময় এরকম কথা বলা হয়, যেমন, আকাশের চাঁদের দিকে যদি কেউ তাকিয়ে না থাকে তখন কি চাঁদের আর অস্তিত্ব থাকবে না? আসলে, মনুষ্যজাতি না থাকলে প্রাকৃতিক জগতের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই এ কথা ঠিক - পাশাপাশি দুটি ডালে কিছু পাখী বসে থাকার ঘটনা তাতে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হবে না, কিন্তু সেটি যে '2+3=5' এই বিবৃতির সত্যতার একটি নিদর্শন, সে কথার তখন আর কোনই তাৎপর্য থাকবে না (কোন কোন মনুষ্যেতর প্রাণীর সংখ্যা সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা রয়েছে, এ কথা আপাতত ধরছি না) । ঠিক তেমনই, আকাশের চাঁদের দিকে কেউ তাকাক চাই না তাকাক, চাঁদ নামক জ্যোতিষ্কটির তাতে কিছুই যায় আসে না (এটিই আসলে বস্তুবাদী দর্শনের মূল কথা), কিন্তু চাঁদ বলতে আমরা চোখের দেখায় যা বুঝি (চাঁদ সম্পর্কে আমরা কিন্তু অতি অল্পই জানি) সেই ধারণাটি সেই মুহূর্তে কারুর মানসপটে বিরাজ করবে না। বিশ্বজগতের যে কোন বস্তুই আমাদের অনুভূতিতে, জ্ঞানে, ও চেতনায় কোন এক ভাবে আভাসিত হয়, তবে সেই বস্তুর স্বতঃ-নির্ধারিত গুণগুলি কিন্তু আর এক ব্যাপার (এই সব গুণ, বস্তুত, অসীম-মাত্রিক)। আর, গোটা মনুষ্য-জাতি যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে চাঁদ সম্পর্কে মানুষ এতদিন ধরে যে সব ধারণা তৈরী করেছে তার সবই তখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যদিও চাঁদ তখনও তার আপন মহিমায় তার সকল (অসীম-মাত্রিক) গুণ সহ আকাশে বিরাজমান থাকবে।

প্লেটো-বাদী (বা বাস্তবতা-বাদী) গাণিতিক দর্শনকে এক অর্থে খুবই আলগা একটা দর্শন বলা চলে, কারণ সেটি গণিতের বোধ-নিরপেক্ষতা বলতে যা বোঝায় তা খুবই দুর্বোধ্য । অবশ্য 'দুর্বোধ্য' কথাটি একান্তভাবেই ব্যক্তি-নির্ভর । আমার কাছে যা দুর্বোধ্য, কার্ট গোয়েডেলের কাছে তা নিশ্চই দুর্বোধ্য ছিল না। আবার, প্লেটো-বাদ যখন গাণিতিক সত্যের জগৎ বলতে বোঝায়

আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের এক জগৎকে তখন একইভাবে আমার কাছে তা দুর্বোধ্য ঠেকে, কিন্তু কার্ট গোয়েডেল নিশ্চই তার ভিতর আপত্তির কিছু দেখতেন না। বহু খ্যাতনামা গাণিতিক প্লেটো-বাদকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, আবার সেরকম অনেকেই প্লেটো-বাদ স্বীকার করেন না । তবে প্লেটো-বাদ যখন বলে যে গণিতের লোকোত্তর জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান জন্মায় এক অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় তখন প্লেটো সে অন্তর্দৃষ্টিকে কী চোখে দেখতেন বা কার্ট গোয়েডেলই বা কী ব্যাখ্যা দিতেন তার, সে সম্পর্কে আমার ধারণা অতি অল্প (আমার নিজের গাণিতিক অন্তর্দৃষ্টি খুবই ক্ষীণ) হলেও আমার কিন্তু মনে হয়, একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয় সে কথা। এবারে আসব সে প্রসঙ্গে। তবে তার আগে সেরে নিতে হবে দ্বিতীয় পর্বের সারসংক্ষেপ।

গণিত-দর্শন- দ্বিতীয় পর্ব- সারসংক্ষেপ ।।

ডেভিড হিলবার্ট গণিতে প্রমাণ-প্রকরণের ওপর জোর দিয়ে, একে বেঁধে দিলেন এক প্রস্থ সুনির্দিষ্ট নীতির গণ্ডীর ভিতর, এবং এ থেকেই জন্ম নিল সীমা-নিবদ্ধ দর্শন ও গণিতের ধারাটি। তবে তিনি কিন্তু চিরায়ত গণিতের অনন্ত-আশ্রয়ী বিবৃতিগুলিকে ফেলে দিতে চান নি, কারণ এগুলি গণিতকে দিয়েছে অসাধারণ সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য, যার দরুন উপকৃত হয়েছে বিজ্ঞান। অবশ্য হিলবার্টের কাছে বিবৃতিগুলির তাৎপর্য ছিল ভিন্ন, কারণ তিনি ছিলেন আঙ্গিক-বাদের সমর্থক, যা গাণিতিক বিবৃতিগুলিকে দেখে কিছু সংকেত-চিহ্নের বিন্যাস রূপে। বিবৃতিগুলির অর্থ বা তাৎপর্য কী, তা নিয়ে তিনি আলাদা ভাবে ভাবতে রাজী ছিলেন না, এবং এখানেই বোধ-বাদের পথ আর তাঁর পথ হয়ে গিয়েছিল ভিন্ন, কারণ বোধ-বাদ প্রমাণের অতীত সত্যতার ধারণার বদলে জোর দেয় গাণিতিক বিবৃতিগুলির অর্থের উপর। বোধ-বাদ বলে, গণিত-চর্চা কোন সুদূরলোকের উদ্দেশ্যে অভিযান নয়, গণিত-চর্চা একটি মানসিক ক্রিয়া, যেখানে গাণিতিক তাঁর বোধ-বৃত্তি ও মনন-ক্রিয়ার মাধ্যমে নির্মাণ করছেন গাণিতিক সত্য, ভাস্কর যেমন গভীর মনঃসংযোগে নির্মাণ করেন নিখুঁত মূর্তি।

বিংশ শতকের জন্মলগ্নে হিলবার্ট গাণিতিকদের সম্মুখে প্রশ্ন রেখেছিলেন, সীমা-নিবদ্ধ প্রমাণ-প্রকরণ কাজে লাগিয়ে কি প্রমাণ করা যাবে, যে চিরায়ত গণিত স্ববিরোধ-মুক্ত (স্মরণ করা যেতে পারে, গাণিতিকদের একটি বড় অংশ মনে করেন, সমগ্র গণিত শাস্ত্রকেই পাটিগণিত শাস্ত্র থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে গড়ে তোলা সম্ভব)? এখানে হিলবার্ট ‘স্ববিরোধ-মুক্ত’ কথাটির ব্যাখ্যা করেছিলেন আঙ্গিক-বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে - যে ব্যাখ্যাটি ছিল চিরায়ত গণিতের কাছেও গ্রহণযোগ্য। হিলবার্টের এই প্রশ্নটিকে গাণিতিকেরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন, কারণ, চিরায়ত গণিত যদি স্ববিরোধ-মুক্ত (অর্থাৎ সু-সঙ্গত বা consistent) হয় তবে তা সীমা-নিবদ্ধ গণিতের যাথার্থ্যের ধারণাটিকে রক্ষা করবে, অর্থাৎ চিরায়ত গণিত এমন কোন বিবৃতিকে যথার্থ বলে রায় দেবে না যা সীমা-নিবদ্ধ গণিতের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী

যথার্থ নয় (এই সিদ্ধান্তের অন্তরালবর্তী কারণটি হল, চিরায়ত গণিতের প্রমাণ-প্রকরণ সীমা-নিবদ্ধ গণিতের অনুরূপ)। হিলবার্ট অবশ্য আর একটু আশাবাদী ছিলেন - তিনি ভেবেছিলেন, চিরায়ত গণিতকে স্ববিরোধিতা-মুক্ত প্রমাণ করতে পারলে এটাও প্রতিষ্ঠিত হবে যে চিরায়ত গণিত শুধু সীমা-নিবদ্ধ গণিতের যাথার্থ্যের ধারণাটি রক্ষা করে তাই নয়, বোধ-বাদী গণিতের যাথার্থ্যের ধারণাটিও রক্ষা করে, এবং এইভাবে বোধবাদের কাছে চিরায়ত গণিতকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যাবে। কার্ট গোয়েডেল যে তাৎপর্যপূর্ণ উপপাদ্যগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার ভিতর একটি উপপাদ্য দেখাল, হিলবার্টের প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর, বস্তুত, সম্ভব নয়। ফলত, চিরায়ত গণিত আর বোধবাদী তথা নির্মিতিবাদী গণিতের ভিতর কোন 'মীমাংসা'য় পৌঁছনর সম্ভাবনাটি হয়ে রইল সুদূরপরাহত।

অর্থাৎ, গণিত ব্যাপারটি কিন্ত নির্বিকল্প কিছু নয়। গণিতের বিস্তৃত কাঠামোটির ভিতর যদি চিরায়ত গণিত আর বোধবাদী তথা নির্মিতিবাদী গণিতের সহাবস্থান সম্ভব হয় তবে এই সত্যটিও প্রতিষ্ঠিত হয় যে গণিত প্লেটো-বর্ণিত কোন সুদূরলোকের স্বতঃ-নির্ধারিত শাশ্বত সত্যের সংগ্রহশালা নয়, গণিত আসলে মানুষের বোধ-বৃত্তি ও মনন-ক্ষমতা সঞ্জাত বহুবিধ ধারণার সমাহার। অবশ্য প্লেটো-বাদ এক দৃষ্টিকোণ - 'বাইরের' কোন যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণে তার খন্ডন সম্ভব নয়। আর, খন্ডন যে খুব জরুরী, তাও নয়, কারণ প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দৃষ্টিকোণ থাকে, এবং তা থাকা স্বাভাবিক। গাণিতিকের গণিত-চর্চার আড়ালে দৃষ্টিকোণ যাই থাকুক না কেন, তাঁর গাণিতিক প্রমাণগুলি নিশ্ছিদ্র হলেই হল। অবশ্য গণিত শুধু প্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে নেই, গণিতের অন্যতম স্তম্ভ হল মানুষের অনুমান-ক্ষমতা (আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, ব্যাপ্তি-অনুমানের ক্ষমতা, এ বিষয়ে পরবর্তী পর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য) - দৃষ্টিকোণ বা দর্শন এই অনুমান-ক্ষমতাকে অনেক সময় উজ্জীবীত ও প্রশস্ত করে তুলতে পারে, আবার অনেক সময় কমবেশি সীমিতও করতে পারে।

প্লেটো-বাদকে অনেক সময় বাস্তবতা-বাদ আখ্যা দেওয়া হয়, আর বোধ-বাদকে বলা হয় ভাববাদী দর্শন। প্লেটো-বাদ বাস্তবতা-বাদ এই অর্থে যে তা মানুষের ভাবনা-নিরপেক্ষ এক গাণিতিক বাস্তবতার কথা বলে । তবে সেটি এক অনৈসর্গিক বাস্তবতা, তাই এই নামকরণের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। বিপরীতে, বোধ-বাদ বলে, মানুষের বোধ ও মনন-ক্রিয়ার বাইরে গণিতের অস্তিত্ব নেই, তাই প্রচলিত ধারণায় তা ভাব-বাদ। বিজ্ঞানে ও অধিবিদ্যায় ভাব-বাদ কথাটির প্রচলিত অর্থ হল, এমন এক মতবাদ যা বলে যে প্রাকৃতিক জগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তা সম্পূর্ণই মন-নির্ভর। এটি কিন্তু একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ, বোধ-বাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আসলে মানুষ যেমন প্রাকৃতিক জগতের অংশ, মানুষের মনও তেমনি অংশ, মন কোন অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক কিছু নয়। মানুষের বোধ-বৃত্তি ও মনন-ক্ষমতা একান্তভাবে বস্তু-নির্ভর। তাই বোধ-বাদকে ভাব-বাদ আখ্যা দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়। এখানে আর একটি প্রশ্ন ওঠে, বোধবাদ যদি বলে যে গণিত মন-নির্ভর তা হলে গণিতের সর্বজনীনতা থাকে কোথায়? গণিত ত তা হলে ব্যক্তির খামখেয়াল বা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে বাঁধা পড়ে যায়। এ ভয়ও, বস্তুত, অমূলক। গাণিতিক ধারণাগুলি উদ্ভূত হয় ব্যক্তিমনের অভ্যন্তরে, কিন্তু নানান ধাপের ভিতর দিয়ে ঊর্ধপাতিত হয়ে ক্রমশ সেগুলি সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে, যেখানে আর ব্যক্তিগত খেয়ালের কোন জায়গাই থাকে না - বস্তুত, ক্রমবিবর্তনের পথে এই চূড়ান্ত জায়গায় না পৌঁছলে কোন ধারণা গণিত পদবাচ্যই হয় না। তাই, বাস্তবতা-বাদ বা ভাব-বাদ শুধুমাত্র একটা নামকরণের ব্যাপার নয়, এটি গণিত সম্পর্কে দৃষ্টিকোণেরও ব্যাপার।

তবে প্লেটো-বাদ যখন গাণিতিক সত্যের অনুসন্ধানে 'অন্তর্দৃষ্টি'র কথা বলে তখন সে অন্তর্দৃষ্টিকে কিন্ত অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত বলে উড়িয়ে না দিয়ে বিজ্ঞানের চোখে দেখার চেষ্টা করা যেতেই পারে। আর, প্লেটো-বাদ যখন বলে যে গাণিতিক সত্যতা আর প্রমাণ-যোগ্যতা এক কথা নয় তখন তা বোধ-বাদী চিন্তার তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন হলেও একটি বিকল্প ভাবনা হিসেবে সেটির গ্রহণযোগ্যতা থেকেই যায়। এই নিবন্ধের তৃতীয় পর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করব এই দুই প্রসঙ্গ নিয়ে।

তৃতীয় পর্ব ।।

এক ।।

গণিত: ধারণার জগৎ ।।

গণিতের দর্শন নিয়ে গাণিতিকদের ভিতর বিভাজন খুব একটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ দর্শন হল একটা দৃষ্টিভঙ্গী - দৃষ্টিভঙ্গী এক এক জনের এক এক রকম হতেই পারে। বস্তুত, নানান দৃষ্টিভঙ্গীর ঘাত-প্রতিঘাতেই যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ক্রমশ এগিয়ে চলে । কিন্তু, গণিত-চর্চার অন্দরমহলে দু রকম দর্শন থেকে গাণিতিক চর্চার দুই ভিন্ন ধারা তৈরী হবে, এ কেমন কথা ? আগেই বলেছি, চিরায়ত গণিত আর বোধ-বাদী (বা নির্মিতি-বাদী) গণিত, এই দুই ধারার ভিতর পার্থক্য রয়েছে, যদিও সে পার্থক্য কতটা গভীরের ব্যাপার তা এক কথায় বলা খুব মুশকিল। গণিতের যে সব প্রধান ও মৌলিক সমস্যা নিয়ে গাণিতিকরা চিন্তা-ভাবনা করেন সেগুলি দুই ধারার গণিতেই মূলত একই ধরনের, সমাধানের অভিমুখও খুব একটা পৃথক নয়, তবে সে সব সমাধানের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য দুই ক্ষেত্রে ভিন্ন। বস্তুত এই দুই ধারার তুলনায় অনেকটা স্বতন্ত্র আরো একাধিক ধারাও লক্ষ্য করা যায় যেগুলি, অন্তত কিছুটা হলেও, গণিত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা সূচীত করে। তবে, গণিত সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা, আর গণিত-চর্চার অন্দরমহলে একাধিক ধারার ভিতর ভিন্নতা, এ দুটি কিন্তু এক নয়। গণিত সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী এক এক জনের এক এক রকম, হয়ত স্থূল বিচারে সেগুলিকে দুটি, তিনটি, বা কয়েকটি প্রধান ধারার গণিত-

দর্শনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা যায় । এই সব দৃষ্টিভঙ্গীর ঠিক-ভুল বিচার করার কোনই অর্থ নেই - কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গানিতিকরা যখন গণিত-চর্চা করেন তখন তাঁদের চর্চার ভিতর পার্থক্য কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার - কারণ গণিত-চর্চার প্রতিটি ধারার ভিতরই স্বতন্ত্রভাবে ঠিক-ভুলের নিরীখটি অত্যন্ত তীক্ষ্ম । যেমন, কোন নির্মিতি-বাদী গাণিতিক যখন একটি বিবৃতির প্রমাণ দেন তখন সেটি ঠিক না ভুল, সে বিষয়ে কিন্ত কোন মতপার্থক্যের জায়গা নেই (মতপার্থক্য থাকলেও তা অত্যন্ত বিরল, এবং শেষ পর্যন্ত তা একটা মীমাংসার জায়গায় পৌঁছয়), এমন কি কোন গাণিতিক যদি চিরায়ত গণিতের চর্চা করেন তবু তিনি সে প্রমাণের ঠিক-ভুল বিচার করবেন অভ্রান্ত ভাবেই, কারণ নির্মিতি-বাদী গাণিতিকের অনুসৃত মূল নীতিগুলি কি, তার ভিতর কোন অস্পষ্টতা নেই, এবং সব গাণিতিকই তা জানেন (অথবা প্রয়োজনে জেনে নিতে পারেন)।

তা হলে ধরা যাক দুই গাণিতিক ‘ক’ আর ‘খ’, দু জনের অবস্থান দুই ভিন্ন গণিত-দর্শনের শিবিরে (যেমন, প্লেটো-বাদী দর্শন, আর বোধ-বাদী দর্শন), গণিত সম্পর্কে এঁদের দু জনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বিস্তর। এঁদের গণিত-চর্চার ভিতরও পার্থক্য থাকা সম্ভব, হয়ত দু জনে দুই ভিন্ন ধারায় গণিত চর্চা করেন, যদিও দেখা যাবে যে সেই দুই ধারার ভিতর পার্থক্য অতটা প্রকট নয়, হয়ত কিছু মূল স্বীকৃতি ও যৌক্তিক নীতির পার্থক্য, এবং গাণিতিক বিবৃতি ও উপপাদ্যগুলির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যে পার্থক্য (‘ক’ হয়ত কিছু উপপাদ্যকে অর্থপূর্ণ মনে করেন, ‘খ’ হয়ত তা করেন না) - তবে গণিত-চর্চার ভিতর নির্দিষ্ট কিছু পার্থক্য যাই থাক, দু জনেরই চর্চার ঠিক-ভুল বিচারের মাপকাঠি অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ম - দুই ক্ষেত্রেই তা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ।

অর্থাৎ, এক দিকে গণিত-চর্চার ভিতর একাধিক ভিন্ন ধারার অস্তিত্ব, আর অপর দিকে প্রতিটি ধারার ভিতরই সুনির্দিষ্টতা ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা - এটি গণিতের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, যদিও বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রেও কখনো কখনো এরকম একাধিক ধারার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে আপাতত যা ভেবে দেখার মত তা হল, এই যে গণিত-চর্চার ভিতর ভিন্ন ভিন্ন ধারা-উপধারা (নির্মিতিবাদী গণিতের ভিতর একাধিক উপধারা লক্ষ করা যায়), এর সঙ্গে কিন্তু গাণিতিক সত্য সম্পর্কে প্লেটোবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক মেলে না (তবে প্লেটোবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ভুল, এ কথা বলছি না, কারণ, আগেই বলেছি, দৃষ্টিভঙ্গীর ঠিক-ভুল বিচার সর্বদা সহজ নয়, আবার কার্যকরও নয়) - গাণিতিক সত্যগুলি এক একটি স্বয়ংসিদ্ধ ‘বস্তু’, গণিতের নিজস্ব জগতে সেগুলি এক একটি

শাশ্বত সত্তা, এ কথা যদি ঠিক হত, তবে গণিতের ভিতর এত ধারা উপধারা সম্ভব হত না, এত ভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব হত না । গণিত-দর্শনের ভিন্নতা স্বতন্ত্র ব্যাপার, তা নিয়ে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু গণিত-চর্চার অভ্যন্তরে ভিন্নতা, এটা দেখিয়ে দেয় যে গাণিতিক বিবৃতিগুলি স্বয়ংসিদ্ধ নয়, এগুলির কোন লোকোত্তর অস্তিত্ব নেই, এগুলি এক একটি নির্মিতি - নির্মাতার হাতের গুণে এদের ভিতর ভিন্নতার উদ্ভব। কিন্তু আবার এ কথাও ঠিক যে নির্মাতা যিনিই হোন না কেন, তিনি কোন কোন নীতি অনুসরণ করে নির্মাণকার্য করছেন তার বিশদ, স্পষ্ট, ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ বা তালিকা থাকতেই হবে - এ থেকে যদি তিনি বিচ্যুত হন, তবে কোনমতেই তার অনুমোদন নেই, কারণ এ দিয়েই নির্ধারিত হয় গণিতের ঠিক-ভুল।

> আগেই বলেছি, গণিত-চর্চার মূল উপাদান হল কিছু স্বীকৃতি, আর উপপাদনের কিছু নিয়ম। তাহলে এটাই বলতে হয়, কোন গাণিতিক যখন কিছু প্রমাণ করছেন তখন ঐ স্বীকৃতি ও উপপাদনের নিয়মগুলি বিশদ ও স্পষ্ট ভাবে বিবৃত হয়েছে । কিন্তু জগতে একশ শতাংশ স্পষ্টতা কোন কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা যখন এমন কোন নিয়ম অনুসরণ করে কোন কাজ করি যা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ তখনও তার ভিতর অকথিত অনেক কিছু থেকে যায় যার দরুন নিয়মের সর্বজনীনতা ব্যত্যয়হীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন লুডভিগ ভিটগেনষ্টাইন, এবং বিশদ আলোচনা করেছেন বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক সল কৃপকে। যে কোন নিয়মই গঠিত হয় অন্য নানান নিয়মের উপর ভিত্তি করে, আর সেগুলিও একইভাবে নির্ভর করে অন্যান্য আরো নিয়মের উপর। এইভাবে নিয়মের সোপান ভেঙ্গে নামতে থাকলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, আমরা এমন কিছু নিয়ম থেকে শুরু করি যেগুলি মূলত দৃষ্টান্ত-নির্ভর, যার ভিতর অকথিত অংশ অপেক্ষাকৃত কম, যেগুলি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নিরীখে সর্বজনীন, যদিও তাদের প্রযোজ্যতার গণ্ডী অনেক সীমিত। এর পরের ধাপের নিয়মগুলি ঐ সব প্রাথমিক নিয়মের ভিত্তিতে নির্মিত, এদের প্রযোজ্যতার গণ্ডী একটু বিস্তৃত, এদের ভিতরও অকথিত অংশ রয়েছে, কিন্তু ঐ সম্প্রসারিত গণ্ডীর ভিতর তারা ব্যবহারিক বিচারে সর্বজনীন। এ ভাবে ধাপে ধাপে সোপান ধরে এগোলে পরবর্তী ধাপগুলিতে নির্মিত নিয়মগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের ভিতরকার অকথিত অংশ সত্ত্বেও তাদের প্রযোজ্যতার গণ্ডী বিশাল, অথচ তবু তারা ঐ গণ্ডীর ভিতর সর্বজনীন। প্রতিটি ধাপেই নতুন নিয়মগুলি নির্মিত হয় সামান্যীকরন ও বিমূর্তকরনের মাধ্যমে, যা আমাদের মনন-ক্ষমতার এক বিশেষ গুণ।

অর্থাৎ, গণিত হল সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতির ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আমাদের মনন-ক্ষমতা প্রয়োগ করে নানাবিধ ধারণার নির্মাণ। তবে যে কোন এক প্রস্থ সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি থেকে শুরু করে যে

কোন এক প্রস্থ যৌক্তিক নীতি প্রয়োগ করে যে কোন এক প্রস্থ বিবৃতি প্রতিষ্ঠা করলেই তা কিন্তু গণিত পদবাচ্য হয় না । গণিতের অনুশাসন অতি পরিব্যাপ্ত ও অতি অমোঘ। গণিতের একটি ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসই বলে দেয়, আজকের দিনের গণিতে কোন কোন প্রশ্ন অর্থবহ ও ওগুরুত্বপূর্ণ। সুদূর অতীতে গণিত নিশ্চই শুরু হয়েছিল বাস্তবের কিছু অভিজ্ঞতার নির্যাস নিয়ে, কিছু অভিজ্ঞতা থেকে বিমূর্তকরন প্রক্রিয়ায় কিছু বাস্তব সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে। সেই প্রাথমিক জায়গা থেকে তার পর একটু একটু করে তৈরী হতে থাকল গণিতের নিজস্ব স্বীকৃতির তালিকা (এক অতি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় যা ক্রমশ পেতে থাকল সূক্ষ্ম ও বিদগ্ধ রূপ), নিজস্ব যৌক্তিক নীতি, আর নিজস্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্র - আমাদের ধারণার জগতে গণিত তার নিজের একটি জায়গা করে নিল, যা প্রাকৃতিক বাস্তবতা বিষয়ে মানুষের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটির তুলনায়, অর্থাৎ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের তুলনায় স্বতন্ত্র, অথচ যার শিকড় রইল প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভিতর প্রোথিত। আজকের দিনের গণিতের অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিগুলি এসেছে গতকালকের গণিতের অমীমাংসিত নানান প্রশ্ন থেকে - এই সব প্রশ্ন নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে হয়ত অভাবনীয় ভাবে খুলে গেছে নতুন দরজা, তৈরী হয়েছে গণিতের নতুন শাখা। আবার একই ভাবে আজকের গণিত-চর্চা থেকেই নির্ধারিত হবে আগামী দিনের গণিতের অবয়ব। আজকের কোন গাণিতিকের চিন্তা, তা যতই অভিনব হোক না কেন, গণিতের দীর্ঘ-বিবর্তিত ও অতি-বিস্তৃত জগৎটির ভিতরেই তার জায়গা, গণিতের ইতিহাসের সঙ্গে তা গ্রথিত - তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আর গণিত পদবাচ্য হবে না তা।

মানুষের জীবন-চর্চার ইতিহাসই এই - অতীতের সদর্থক অভিজ্ঞতার জমিতে এক পা রেখে অজানা ভবিষ্যতের দিকে আর এক পা বাড়িয়ে দেওয়া। আর, মানুষের বোধ-বৃত্তি ও মানসিক চর্চাও স্বভাবতই অনুসরণ করে সেই পথ - এই চর্চায় মানুষের সব চাইতে বড় সম্বল, অনুমান-ক্ষমতা - অনুমান, বস্তুত, অতীতের সদর্থক শিক্ষা কাজে লাগিয়ে অজানা সমস্যা সমাধানের প্রয়াস। এই অনুমান-ক্ষমতা (যার বিশেষ অবলম্বন হল *ব্যাপ্তি-অনুমান*) প্রয়োগ করেই আমরা গড়ে তুলি নানান গাণিতিক ধারণা। এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা বাকি রয়ে গেল, সে আলোচনায় ফিরব আর একটু পরে।

গাণিতিক বিবৃতি ও গাণিতিক সত্যগুলির অধিষ্ঠানভূমি হল আমাদের ধারণার জগৎ। কিন্তু, ‘ধারণার জগৎ’ কথাটি কি খুবই অস্পষ্ট ও খুবই আলগা হয়ে গেল না? অস্পষ্ট ও আলগা হলেও

‘মানুষের বোধের বাইরে লোকোত্তর জগৎ’, এই শব্দবন্ধের তুলনায় অনেকটাই স্পষ্ট, আর অনেকটাই নির্দিষ্ট, অনেকটাই বোধগম্য। এ দিক দিয়ে দেখলে বোধ-বাদ গণিত সম্বন্ধে আমাদেরকে যে ধারণা দেয়, তা তুলনায় বেশি স্পষ্ট, বেশি ইঙ্গিতবহ। তা হলে কি এটাই দাঁড়াচ্ছে না যে আমি প্লেটো-বাদ বা গাণিতিক বাস্তবতা-বাদকে নস্যাৎ করে বোধবাদকেই তুলে ধরতে চাইছি? আসলে, একদমই তা নয়। গন্ডগোলটা আসলে অন্য জায়গায়। গন্ডগোলটা হল, গণিতের দর্শন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, মানুষের বোধবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির এক মহিমময় প্রকাশ, সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বহু দূরবর্তী এক অনৈসর্গিক জগতের দিক-নির্দেশ - এইভাবে ভাবার প্রবণতা। জীবন-দর্শনকে যখন জীবনের চাইতে বড় করে দেখা হয় তখন সেই জীবন-দর্শনের চাপে পড়ে পিষ্ট হয় মানুষ। তেমনই, এমনটাও ভাবা যেতে পারে, গণিত-দর্শন গণিতকে একটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে নানা ভাবে দেখার একটা প্রয়াসের বাইরে আর কিছু নয় - এই প্রয়াসের হাত ধরেই গণিত তার সকল অনির্বচনীয়তা ও অসাধারণত্ব সত্ত্বেও জীবনের অঙ্গীভূত এক মানসিক চর্চা হয়ে ওঠে, যেখানে গণিত সম্পর্কে মানুষের শ্রদ্ধা থেকে যায় কিন্তু দূরত্ব কমে যায়, গণিত-চর্চা না করেও যেখানে গণিত ব্যাপারটা কী, সে সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা তৈরী করে নিয়ে মানুষ তার সংস্কৃতিকে ও তার অস্তিত্বকে আর একটু অর্থবহ করে তুলতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ভিটগেনষ্টাইনের কথা একটু বলে নেওয়া যেতে পারে। ভিটগেনষ্টাইন তাঁর সারা জীবনের দর্শন-চর্চায় যত বিষয় নিয়ে ভেবেছিলেন, তার ভিতর সিংহভাগ জুড়ে ছিল গণিত। গণিত বিষয়ে তাঁর পান্ডুলিপির আয়তন ছিল কয়েক হাজার পৃষ্ঠা, কিন্তু তিনি তার কোন কিছুই মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন নি। গণিতের দর্শন নিয়ে তিনি যত কথা বলেছেন ও ভেবেছেন তা কিন্তু কোন একটা সুগ্রথিত সার্বিক দর্শন নয়। তিনি টুকরো টুকরো নানা কথায় দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন, গণিতের দর্শন ব্যাপারটাকে অতিরিক্ত মহান করে তোলার বিপদ কোথায়। গণিত, আর তার বাইরে বৃহত্তর জীবন, এই দুইয়ের ভিতর কোন অলঙ্ঘ্য ঈশ্বর-নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই - এই দুইয়ের মাঝে যে বিস্তীর্ণ অস্পষ্ট সীমানা সেটিকে একটু একটু করে বোঝার চেষ্টাই গণিত-দর্শন। যেমন, গণিত-চর্চায় যে সব নিয়ম মেনে নানান বিবৃতি ও উপপাদ্যে আমরা পৌঁছই সে নিয়মগুলি সর্বজনীন, সেগুলির কোন ব্যত্যয় নেই, এ কথারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে - সে সীমাবদ্ধতা ঠিক কোথায় সেটাই ঠিকমত বোঝা দরকার। তাতে গণিতের গভীরতা খর্ব হবে না, অথচ গণিত হয়ে উঠবে আরো প্রাণবন্ত। আমরা এর পর গণিত-দর্শনে স্থাপত্যবাদ (structuralism) নিয়ে অল্প দু-এক কথা আলোচনা করব। সেখানে আমরা দেখব, গণিত বহুবিধ স্থাপত্যের এক সমাহার, যেমন বিমূর্ত বিজগণিত (abstract algebra বা সংক্ষেপে শুধু algebra; এর ভিতর আবার রয়েছে নানান স্বতন্ত্র স্থাপত্য), জ্যামিতি (এর ভিতর আবার রয়েছে ইউক্লিডীয়

জ্যামিতি, অভিক্ষেপ-জ্যামিতি বা projective geometry, ইত্যাদি), স্থান-তত্ত্ব (topology), এ রকম ছোট-বড় নানান নির্মিতি । তবে যদি বলা হয়, এই স্থাপত্যগুলিই গণিতের আসল সারবস্তু (স্থাপত্য-বাদীরা যা বলতে চান), তা হলে কিন্ত বড় রকম বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। 'আসল সারবস্তু' এই কথাটিই বিপজ্জনক, ভিটগেনষ্টাইন এটাই বলতে চেয়েছিলেন।

তাই 'প্লেটো-বাদ' বা 'বোধবাদ' এই নামকরণের ভিতর দিয়ে কোনরকমে একটা ছাপ মেরে দিয়ে সব কিছুকেই সেই ছাপ ধরে বিচার করলে সে বিচার হয় যান্ত্রিক ও প্রাণহীন। আবার, অনেকে ভয় পান, অনেক রকম দর্শন ধরে এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছু নিয়ে এগোতে চাইলে দর্শনের শুদ্ধতা খর্ব হতে পারে, সব কিছুই তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে। তবু বলব, 'শুদ্ধতা' কিন্তু শেষ কথা নয়, কারণ জীবন কিন্তু সে অর্থে 'শুদ্ধ' কিছু নয় - জীবনের অনন্ত জটিলতাকে বোঝার জন্য 'শুদ্ধতার' অনেক সময় প্রয়োজন পড়ে, এই পর্যন্ত, এর বেশি কিছু চাইলে তা হয় বিভ্রান্তিজনক।

গণিত মানুষের বোধ-বৃত্তি ও বৌদ্ধিক ক্রিয়ার এক বিশেষ ক্ষেত্র - বোধবাদের এই উপলব্ধি আমাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির অনেক কাছাকাছি। গণিতের বিবৃতিগুলি সেই বিশেষ ক্ষেত্রের ভিতর এক একটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা বৈ আর কিছু নয় । গাণিতিক সত্যগুলির অস্তিত্ব আমাদের ধারণার জগতে - এ কথা স্বীকার করে নিলে গণিতের মহিমা খর্ব হয় না । আমাদের ধারণার জগৎ, বস্তুত, এক অতি বিচিত্র, অতি জটিল, ও অতি বিস্তৃত জগৎ। এই জগৎটি আমাদের জীবনে সব চাইতে বড় সম্বল, অথচ এটিকে বোঝা খুব সহজ কাজ নয়, এর এক একটি ক্ষুদ্র অংশ সম্পর্কে আমাদের কিছু জ্ঞান, কিছু উপলব্ধি গড়ে ওঠা সম্ভব, কিন্তু সে উপলব্ধি যথেষ্ট ভঙ্গুর - এই উপলব্ধির ভাঙ্গা-গড়া নিয়েই তৈরী হয় দর্শন। তবে গাণিতিক সত্যগুলি আমাদের ধারণার জগতের অন্তর্গত, শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট নয়, কারণ এর পর প্রশ্ন থেকে যায়, গাণিতিক সত্যগুলি তা হলে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হয় কী ভাবে, আর সেগুলি অমোঘ ও অলঙ্ঘ্যই বা হয় কি ভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ নয়, আমি আমার সামান্য বোধ-বুদ্ধি মত এর কিছু আভাস এই নিবন্ধে দিয়েছি, আরো কিছু আলোচনার অবকাশ হবে পরবর্তী অংশে। তবে প্লেটো-বাদ সম্পর্কে একটি নিগূঢ় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় উপরোক্ত ভাবনা থেকে - গাণিতিক সত্যগুলির নাগাল আমরা পাই কী ভাবে? গণিতের অবস্থান যদি হয় আমাদের ধারণার জগতে,

তবে এই প্রশ্নের উত্তর একান্ত সহজ ও স্বচ্ছ - আমাদের মনন-ক্রিয়ার মাধ্যমেই নাগাল পাই গাণিতিক সত্যের। জীবনের সকল অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, ও জ্ঞান, এগুলি অসংখ্য ধারণার সমন্বয়। ধারণা হল মনন ও চিন্তার স্বয়ং-সম্পূর্ণ উপাদান। ধারণাকে বিশ্লিষ্ট করতে গেলে যা পড়ে থাকে তা হল বিচ্ছিন্ন ও টুকরো নানা মনন-কণা, মনন-ক্রিয়ায় যাদের তাৎপর্য অনর্দিষ্ট ও অগোচর। ধারণাগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে জটিল গ্রন্থনে গ্রথিত। বহুবিধ ধারণার বিষয়বস্তু যেমন বহির্জগতের নানান বস্তু বা বস্তুপুঞ্জ, আবার একইভাবে অন্য ধারণাকে উপজীব্য করেও গড়ে ওঠে নতুন ধারণা। আমরা যখন বস্তু সম্পর্কে কিছু বলতে চাই বা কিছু ধারণা গড়ে তুলি তখন আসলে বস্তুগুলির ভিতর অসংখ্য বিচিত্র সম্পর্কই হয় মূল উপজীব্য। আবার ধারণাগুলির ভিতরও থাকে অনন্ত-বিস্তৃত অতি বিচিত্র সম্পর্কের জালক, সেই সম্পর্কগুলিই অধিকাংশ নতুন ধারণার উপাদান। ‘ওই লোকটি আমাকে পছন্দ করে না’, এই বিবৃতিটি একটি অপেক্ষাকৃত সরল ধারণার দ্যোতক। ‘ওই লোকটি যে আমায় পছন্দ করে না, সেটা আমি বুঝে গেছি জেনে ওর রাগ আরো বেড়ে গেছে ’, এখানে বেশ কয়েকটি ধারণার সূক্ষ্ম গ্রন্থনে তৈরী হয়েছে আর একটু জটিল ধারণা।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, গাণিতিক সত্যের অবস্থান কোথায়, আর সে সত্যের নাগাল আমরা কী ভাবে পাই, সে সম্পর্কে অন্তত একটা প্রাথমিক আভাস পাওয়া যেতে পারে বোধ-বাদ থেকে - গাণিতিক সত্যগুলির অবস্থান আমাদের ধারণার জগতে, আর সেগুলির নাগাল আমরা পাই মনন-ক্রিয়ার মাধ্যমে, যে মনন-ক্রিয়া সর্বদাই সংঘটিত হয়ে চলেছে অসংখ্য দৈনন্দিন কাজে-কর্মে, পেশাগত কাজে, সাংস্কৃতিক চর্চায় । তবে আবার বলা দরকার, গণিতের ক্ষেত্রে মনন-ক্রিয়ার কোন বৈশিষ্ট্যের দরুন গাণিতিক ধারণাগুলি তৈরী হয়, এবং গণিত অর্জন করে তার একান্ত নিজস্ব চরিত্র, তা স্বতন্ত্র অনুধাবনের বিষয়। এটা কিন্তু অনেকটাই মনস্তত্ত্বের বিষয়।

> বিজ্ঞান-দর্শনে যেমন, তেমনই গণিত-দর্শনেও মনীষীরা ‘মনস্তত্ত্ব’ নামক বিষয়টিকে সযত্নে এড়িয়ে চলতে চান। মনস্তত্ত্ব যেন এক কোমড় ঘোলাটে জল - সে জলে নামলেই নানান সংক্রমণ আমাদেরকে বিকারগ্রস্ত করে তুলবে। ফ্রেইগে গণিতকে সম্পূর্ণ যৌক্তিক শৃঙ্খলে বাঁধতে চেয়েছিলেন এই কারণে যে, একমাত্র তা হলেই গণিত মুক্তি পাবে ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের খপ্পর থেকে । কার্ল পপার (1902-1994) বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গঠনের ক্ষেত্রে নতুন তত্ত্বের আবির্ভাবে নানান মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের ভূমিকা স্বীকার করেও বলেছিলেন যে সে আলোচনায় ঢোকার কোন অর্থ নেই - সে আলোচনা ‘বৈজ্ঞানিক’ শুদ্ধতায় মন্ডিত নয় (পপারের বক্তব্য আমি যতটুকু বুঝেছি)।

তবে গাণিতিক সত্যের ‘নাগাল পাওয়া’ কথাটি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। এখানে দুটি ভিন্ন বিষয় ধরে ভাবা প্রয়োজন। প্রথমত, কোনো গাণিতিক একটি নতুন গাণিতিক সত্যের আভাস পান কি করে? আর দ্বিতীয়ত, যদি কোনো গাণিতিককে বলা যায়, অমুক বিবৃতিটি প্রমাণ করুন, অথবা বিবৃতিটি ঠিক না ভুল বলুন, অর্থাৎ, বিবৃতিটির যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করুন, তখন তিনি তা করেন কী ভাবে। যেমন, ধরা যাক, গণিতের বহুল-আলোচিত ‘গোল্ডবাখের অনুমান’ (Goldbach’s conjecture) - যে কোন যুগ্ম সংখ্যাকে দুটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল রূপে প্রকাশ করা যাবে (4=1+3, 18=7+11, 42=13+29, ইত্যাদি)। এটি সম্ভবত একটি গাণিতিক সত্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত এর কোন প্রমাণ কেউ দিতে পারেন নি, বা এটিকে ভুলও দেখাতে পারেন নি, অর্থাৎ এর কোন ব্যত্যয় খুঁজে পান নি। এখন প্রশ্ন হল, গোল্ডবাখ এই বিবৃতিটিতে পৌঁছলেন কি ভাবে? স্পষ্টতই, এর জন্য তাঁকে অনুমানের সাহায্য নিতে হয়েছিল, হয়ত তিনি অনেকগুলি যুগ্ম-সংখ্যাকে দুটি করে মৌলিক সংখ্যার যোগফল রূপে প্রকাশযোগ্য দেখে তা থেকে সামান্যীকরণ করে তাঁর নামাঙ্কিত বিবৃতিটিতে পৌঁছেছিলেন - এটি ব্যাপ্তি-অনুমানের একটি দৃষ্টান্ত। ব্যাপ্তি-অনুমান বা inductive inference একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির মনন-ক্রিয়া, যা যৌক্তিক প্রমাণের চাইতে ভিন্ন। আমরা গণিতকে যৌক্তিক চর্চার একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত, কারণ গাণিতিক প্রমাণ সর্বদাই সুনির্দিষ্ট কোন এক প্রস্থ যৌক্তিক নিয়ম প্রয়োগ করে সাধিত হয়, যেখানে এক বিবৃতি থেকে পরের বিবৃতি, আবার সেটি থেকে তার পরের বিবৃতি, এইভাবে একটি শৃঙ্খল অনুসরণ করে সব শেষে উদ্দিষ্ট বিবৃতিতে পৌছন হয়। কিন্তু নতুন কোন গাণিতিক সত্য এইভাবে নিয়মতন্ত্র ধরে পাওয়া যায় না - তার জন্য চাই অনুমান-দক্ষতা, যা আমদের মনন-ক্ষমতার একটি স্বতন্ত্র গুণ - ব্যাপ্তি-অনুমানের ভিত্তি হল এই বিশেষ গুণটি। দর্শন বা মনস্তত্ত্ব এখনো এই বিষয়টিকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে নি। ব্যাপ্তি-অনুমান ঠিক কী ভাবে সংঘটিত হয় তার হদিশ অনেকটাই অজানা, কারণ ব্যাপ্তি-অনুমান প্রধানত একটি অগোচর প্রক্রিয়া।

বস্তুত, গাণিতিক প্রমাণ যদিও একটি যৌক্তিক ক্রিয়া, তবু গাণিতিক যখন কোন বিবৃতি প্রমাণ করেন (ধরে নেওয়া যাক, বিবৃতিটি তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁর কাজ কেবল সেটির যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করা) এবং তার জন্য যখন তিনি ধাপে ধাপে এগোতে থাকেন, তখন যে কোনো

ধাপে পৌঁছে তাঁকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, এবারে কোন যৌক্তিক নীতি প্রয়োগ করে তাঁকে পরের ধাপে পৌঁছতে হবে - অর্থাৎ অনেকগুলি বিকল্পের ভিতর থেকে কোন একটিকে উপযুক্ত বলে বেছে নিতে হয়। এর জন্য তার সহায় হয় তাঁর পূর্ব-অর্জিত গাণিতিক জ্ঞান, কিন্তু তবু তা তাঁকে কোন নিশ্চয়তা দেয় না, ঠিক কী ভাবে এগোলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছন যাবে। যদি তা দিত তবে যে কোন গাণিতিকই সে প্রমাণ সম্পন্ন করতে পারতেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ কল্পনা করা যাক, কোন অভিযাত্রী চাইছেন দূরবর্তী কোন শহরে পৌঁছতে, এবং চলার পথে এক এক জায়গায় এসে তিনি দেখছেন, সম্মুখে পথ কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে গেছে - এর ভিতর ঠিক পথটি না বাছলে তিনি অভীষ্ট শহরে পৌঁছতে পারবেন না। পথ চিনে নেওয়ার কিছু হদিশ হয় ত তাঁর আছে, কিন্তু তবু তা যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ, গাণিতিক যখন আপাতদৃষ্টিতে ধাপে ধাপে যুক্তিশৃঙ্খল ধরে প্রমাণ সম্পাদন করছেন তখনও তাঁকে প্রতিটি ধাপে ব্যাপ্তি-অনুমানের সাহায্য নিতে হচ্ছে - বড় মাপের গাণিতিক আর সাধারণ গাণিতিকের ভিতর তফাৎ হল, প্রথম জনের ব্যাপ্তি-অনুমান ক্ষমতা অনেক বেশি। অবশ্য যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠার কাজটি একবার সম্পন্ন হলে তার পর কিন্তু আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না, এবং গণিতের বইয়ে উৎকীর্ণ দীর্ঘ ও দুরূহ প্রমাণ দেখে আমরা গাণিতিকের যৌক্তিক দক্ষতায় মুগ্ধ ও অভিভূত হই।

এই যে গাণিতিক ব্যাপ্তি-অনুমান, এর বিষয়ে বেশি কিছু জানা নেই, তবে অনেক গাণিতিকই তাঁদের গণিত-চর্চায় কোন না কোন ভাবে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, দুই প্রখ্যাত গাণিতিক পোঁয়াকার (1854-1912) ও অ্যাদামার (1865-1963) কী ভাবে তাঁদের নিজের নিজের গণিত-চর্চায় ‘অন্তর্দৃষ্টি’র গুরুত্বের দিকটিকে তুলে ধরেছেন - দু জনেই বলেছেন, গণিতের নতুন সত্য আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, সেই সত্যের আভাস তাঁদের মানসপটে ফুটে উঠেছিল, তাঁদের অগোচর কোন প্রক্রিয়ায়। শুধু পোঁয়াকার বা শুধু অ্যাদামারই নন, আরো অনেক বিজ্ঞানী ও গাণিতিকও বলেছেন এই একই ধরনের কথা ।

গোয়েডেল যখন বলেন যে অনধিগম্য কোন এক জগতে অবস্থিত গাণিতিক সত্যের হদিশ দেয় গাণিতিকের এক বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি, যা তিনি তাঁর নিজের ক্ষেত্রে অনুভব করেছেন, তখন এটা ধরে নিতে কোন কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয় না যে, গোয়েডেলের এই অন্তর্দৃষ্টি আসলে পোঁয়াকার বা অ্যাদামারের অন্তর্দৃষ্টির অনুরূপ, এবং এটি আসলে কোন অনধিগম্য কিন্তু ‘বাস্তব’ (বস্তুত, অলীক)

জগতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছে না, আসলে এটি কোন এক অগোচর মানসিক প্রক্রিয়ার দ্যোতক, যার মাধ্যমে আমাদের মানসলোকে নতুন ও অভিনব ধারণা গঠিত হয় ।

বস্তুত, দর্শনের ইতিহাসে এই অন্তর্দৃষ্টি বা আদি-বোধের (intuition) প্রসঙ্গটি যুগে যুগে ফিরে ফিরে এসেছে। এর ভিতর সব চাইতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে কান্ট-কথিত আদি-বোধ । আগেই বলেছি, ব্রাউয়ার তাঁর বোধ-বাদী দর্শনের প্রারম্ভিক বিন্দু হিসেবে ধরেছিলেন এই আদি-বোধকে, আবার হিলবার্টও তাঁর আঙ্গিকীয় (formalistic) গণিত-দর্শনে এক ধরনের আদি-বোধকেই গণিত-চেতনার উৎস ধরেছিলেন। এক এক জনের চোখে এই আদি-বোধের তাৎপর্য তথা ক্রিয়াক্ষেত্র ছিল এক এক রকম । প্রাচীন ও মধ্য যুগের দার্শনিকরা অধিকাংশ সময়ই আদি-বোধকে ঐশ্বরিক প্রেরণার রকমফের বলে ভাবতেন, অথবা ধরে নিতেন, এই আদি-বোধ আমাদের ভিতর কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছে। প্লেটো-বর্ণিত ‘মেনো’র (Meno) উপাখ্যানে সক্রেটিস এক দাস-বালকের চেতনার গভীরে নিহিত এই আদি-বোধ কাজে লাগিয়ে তাকে (ঐ বালককে) দিয়ে একটি বর্গক্ষেত্রের দ্বিগুণ ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট অপর একটি বর্গক্ষেত্র আঁকিয়েছিলেন। বালকের ভিতর আদি-বোধ নিহিত না থাকলে তা সম্ভব হত না।

আচ্ছা, আদি-বোধই হোক বা অন্তর্দৃষ্টিই হোক, একে ঐশ্বরিক, অলৌকিক, বা অজ্ঞেয় না ভেবে কি এমন কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা যায় না যা একান্তভাবেই লৌকিক, যা অনেকটাই জানা যেতে পারে অনুসন্ধানের পথ ধরে, যে অনুসন্ধান যুগে যুগে আমাদেরকে দিয়েছে বহুবিধ সত্যের হদিশ ?

এটা যে বাস্তবিকই সম্ভব, তার ইঙ্গিত কিন্তু দুর্লভ নয়। প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আমাদের অচেতন মনন-ক্রিয়া সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে। বিগত কয়েক দশকের চেষ্টায় গবেষকরা লক্ষ করেছেন, অচেতন মনন এমন বহুসংখ্যক জটিল মানসিক ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে যা আগে ছিল ধারণার অতীত (সূত্র [Ki] দ্রষ্টব্য)। বস্তুত, এমন অনেক অচেতন মানসিক ক্রিয়ার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে যেগুলিকে আগে ভাবা হত সচেতন মনন বলে ।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মাইকেল পোলানীর (1891-1976) প্রসিদ্ধ উক্তি: 'আমরা যতটা প্রকাশ করতে পারি তার চাইতে বেশি জানি', অর্থাৎ, আমাদের জ্ঞানভান্ডারে এমন অনেক কিছু সঞ্চিত থাকে যা আমদের গোচর নয়। এই সব জ্ঞান আমরা অর্জন করি অচেতনভাবে। পোলানী লীন বোধ (tacit knowledge) বিষয়ে বিশদ আলোচনা রেখেছিলেন তাঁর বহু রচনায়। অবশ্য তাঁর আগে অনেকেই অচেতন মনন-ক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যাঁদের ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী, মনস্তাত্ত্বিক, ও দার্শনিক হেল্ম্হোলৎজ (1821-1894)। পোলানীর বক্তব্যের সূত্র ধরে আরো সাম্প্রতিক কালে বোধ-বিজ্ঞানী আরথার রেবার অচেতন মননের নানান দিক নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষণ সম্পাদন করেন এবং ক্রমশ অচেতন মনন বিষয়ে ব্যাপক পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান শুরু হয়, আর, শেষ পর্যন্ত বিগত কয়েক দশকে বহু অজানা তথ্য সামনে আসে। উল্লেখ করা যেতে পারে, অচেতন মনন বিষয়ে সিগমুন্ড ফ্রয়েড (1856-1939) ও তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের বিশাল অবদান তার আগেই মনস্তত্ত্বের মূল স্রোত থেকে কার্যত নির্বাসন লাভ করেছিল।

আর একটি সম্ভাবনাময় ও কৌতূহলোদ্দীপক ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিবর্তন-আশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (evolutionary psychology) থেকে (সূত্র [BCT] দ্রষ্টব্য)। জৈব বিবর্তনের পথে প্রাণীর মস্তিষ্ক-সংস্থাপনে (এবং মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নানান আনুষঙ্গিক তন্ত্রের ক্রিয়াশৈলীতে) ক্রমশ বহুবিধ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, যার দরুন নানান ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সাড়ার (response) মাধ্যমে প্রাণী তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। এই প্রাকৃতিক ঘটনারই ধারাবাহিকতায় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক পর্যায়ে মানুষের মস্তিষ্কে তথা মনন-ক্রিয়ায় এমন কিছু ক্ষমতা অঙ্গীভুত হয়েছে যা সামান্যীকরণ, বিমূর্তকরণ, ও যৌক্তিক ক্রিয়ার উপযোগী। অবশ্য এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এখন পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ, এবং মূলত মানুষের নানান সামাজিক আন্তঃক্রিয়ায় এর (অর্থাৎ বিবর্তনের পথে উদ্ভূত মানসিক ক্ষমতা তথা দক্ষতার) ভূমিকা নিয়েই গবেষণা বেশি হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকদের এক অংশের মত, মানুষের হেতু-মননের (reasoning) সহজাত ক্ষমতা বিবর্তনের পথেই উদ্ভূত হয়েছে (সূত্র [To] দ্রষ্টব্য)।

তা হলে এমনটা অনুমান করা কি খুবই অসঙ্গত হবে যে দার্শনিকেরা যে আদি-বোধ বা অন্তর্দৃষ্টির কথা বলেছেন তা আসলে বিবর্তনের পথে উদ্ভূত অচেতন মনন, যা আমদেরকে দেয় ব্যাপ্তি-অনুমানের ক্ষমতা, যার দরুন আমরা অনেকটা অগোচরেই অনুমান-ক্ষমতা প্রয়োগ করে নানাবিধ

সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি (সূত্র [Sm] দ্রষ্টব্য)। এই ক্ষমতার জোরেই দক্ষ গাণিতিক নানান গাণিতিক সত্যের সন্ধান পান, এমনটা ধরে অনুসন্ধানের পথে এগোলে তা কি খুব ভুল হবে? কোন এক অজানা, অজ্ঞেয়, প্রায়-ঐশ্বরিক আদি-বোধের দার্শনিক কল্পনার চাইতে একটি বাস্তবানুগ অনুমান অবলম্বন করে অনুসন্ধানের পথে এগোন কি অনেকটাই বাঞ্ছিত নয় ?

বোধ-বিজ্ঞানী, মনস্তাত্ত্বিক, ও কৃত্রিম-মননের গবেষক বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, ব্যাপ্তি-অনুমানে আমাদের সহায় হয় নানাবিধ হ্রস্ব-বোধের (heuristics) এক বিশাল ভান্ডার । হ্রস্ব-বোধ হল এমন কিছু ধারণা যেগুলির যাথার্থ্য পুরোপুরি প্রমাণিত নয়, যারা অনেক সময় সঞ্চিত থাকে আমাদের অচেতন মনে, এবং যেগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত করে আমরা পৌঁছতে পারি নানান উপযোগী অনুমানে। অর্থাৎ, বহুবিধ ধারণা ও অনুমান গঠনে এই সব হ্রস্ব-বোধ প্রাথমিক উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়ে অনুমানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। গাণিতিক জর্জ পোলিয়া (1887-1985) গাণিতিক অনুসন্ধানে ব্যাপ্তি-অনুমানের ভূমিকা বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাঁর বহুবিধ রচনায় (সূত্র [Po] দ্রষ্টব্য), এবং এ প্রসঙ্গে গাণিতিক হ্রস্ববোধের উপযোগিতাও আলোচনা করেছেন । গাণিতিক হ্রস্ববোধগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এরা অপেক্ষাকৃত স্বল্প তাৎপর্যের সঠিক কিছু গাণিতিক ধারণা যেগুলি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে গাণিতিক অনুমান ও প্রমাণে কাজে লাগে (গণিত ও বিজ্ঞানের কিছু ক্ষেত্র ছাড়া হ্রস্ব-বোধগুলি সাধারাণত প্রমাণিত সত্য নয়, বেশির ভাগ সময়েই এগুলি এক ধরনের অসম্পূর্ণ অনুমান হিসেবেই কাজে লাগে)। তা হলে, গাণিতিক নতুন সত্যের সন্ধান পান কিভাবে, অথবা দুরূহ প্রমাণ সম্পন্ন করার পথে তিনি পদে পদে উপযোগী সিদ্ধান্ত নেন কিভাবে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা যেতেই পারে, বহুবিধ হ্রস্ববোধ সহযোগে গাণিতিকের অচেতন মনে ব্যাপ্তি-অনুমান সংঘটিত হয়, এই অনুমানের পথ ধরে ।

দুই ।।

গণিত-দর্শনে স্বভাব-বাদ ।।

এ প্রসঙ্গে দর্শন-চিন্তায় স্বভাব-বাদের (naturalism) দৃষ্টিকোণটির কথা কিছুটা বলে নেওয়া যেতে পারে। স্বভাব-বাদ 'বিশুদ্ধ' দর্শনে বিশ্বাস করে না । কোন বিষয়ে দার্শনিক অনুমান ধরে বসে না

থেকে সেটি নিয়ে বাস্তবের জমিতে দাঁড়িয়ে অনুসন্ধান চালানোর উপর জোর দেয় স্বভাব-বাদ, যে অনুসন্ধান বস্তুত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মতই অনুমান-যাচাই-সিদ্ধান্ত এই শৃঙ্খল অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত একটি গ্রহণযোগ্য বক্তব্যে পৌঁছতে চায়। অর্থাৎ, স্বভাববাদের মতে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেরই এক ধরনের সম্প্রসারণ হল দর্শন, যেখানে বিজ্ঞান ও দর্শনের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে। অবশ্য এ বিষয়ে চট করে কোন অবস্থান নেওয়া সহজ নয়, কারণ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা শুধু বিজ্ঞানে নয়, সমগ্র মানব-অস্তিত্বের ক্ষেত্রটি জুড়ে, যার ভিতর রয়েছে নৈতিকতা, নান্দনিকতা, মানুষের ক্ষমতা-লিপ্সা, সব কিছুই। স্বভাব-বাদ নিয়ে দার্শনিক তর্ক-বিতর্ক কম নয়, তাই তার ভিতর না গিয়ে শুধু এটুকু বলা চলে যে গণিত-দর্শনে স্বভাব-বাদের দৃষ্টিকোণটির উপযোগিতা খুব কম নয়।

তবে গণিত-দর্শনে স্বভাব-বাদের আলোচনার বেশির ভাগটাই জুড়ে থাকে গণিত-চিন্তায় বহির্জগতের ভূমিকা ও প্রভাবের প্রসঙ্গটি । গণিতের জগৎ কি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেটি কি বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন? তা যদি হয় তবে গণিতকে স্বতঃপ্রতীত ও বৈশ্লেষিক বলতে বাধা নেই। কিন্তু, সত্যিই কি তাই ?

প্রথমেই বলা দরকার, স্বতঃপ্রতীত বলতে শুধু এ টুকুই বোঝায় যে গাণিতিক বিবৃতিগুলির যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠায় বহির্জগতের সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। এই অর্থে গণিত যথার্থই স্বতঃপ্রতীত, কারণ গাণিতিক প্রমাণের জন্য কেবল প্রয়োজন হয় উপযুক্ত কিছু প্রারম্ভিক স্বীকৃতি, আর উপযুক্ত কিছু যৌক্তিক নীতি। কোন গাণিতিক প্রমাণের জন্য গাণিতিককে কখনই পরীক্ষাগারে ছুটতে হয় না।

> অবশ্য সাম্প্রতিক পর্যায়ে গাণিতিক প্রমাণের জন্য গাণিতিকরা যন্ত্রগণকের সাহায্য নিচ্ছেন (বহু-আলোচিত ‘চার রঙ’-এর সমস্যা সমাধানে যন্ত্রগণকের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল), কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে যে যন্ত্রগণক আসলে গাণিতিকের হয়ে কিছু ‘যান্ত্রিক’ কাজ করে দিচ্ছে, তার ভূমিকা এমন কিছু নয় যা বহু সংখ্যক গাণিতিক একযোগে বহু সময় ব্যয় করে করতে পারতেন না - বস্তুত, প্রমাণ ব্যাপারটাই ‘যান্ত্রিক’, এবং হিলবার্ট এটাই চেয়েছিলেন।

তাই, কান্ট কী অর্থে গণিতকে স্বতঃপ্রতীত বলেছিলেন, তার ভিতর না গিয়ে, আমরা বলতে পারি, গণিত সত্যিই স্বতঃপ্রতীত, কারণ গাণিতিক বিবৃতির প্রমাণ একটা 'যান্ত্রিক' ব্যাপার, কিছু স্বীকৃতি (যেগুলি পরস্পর-বিরোধী নয়) আর কিছু যৌক্তিক নীতি, এর বাইরে বিবৃতিটির যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন পড়ে না। ভাল কথা, কিন্তু তা হলে ত এটাও ভাবতে হয়, স্বীকৃতিগুলি আর যৌক্তিক নীতিগুলি কোথা থেকে এল? এটা একটা গুরুতর প্রশ্ন - এর উত্তরে বলতেই হয়, এগুলি পাওয়া গেছে 'বহির্জগৎ' থেকেই, তবে খুব সরাসরি নয় - আমাদের বোধ-তন্ত্রে যে বিশেষ গুনগুলি লীন ও ওতপ্রোত হয়ে আছে, যার একটা অংশ আমরা লাভ করেছি জৈব বিবর্তনের সূত্রে, সেগুলির সহায়তায় বহির্জগৎ থেকে পাওয়া কিছু অভিজ্ঞতা ঊর্ধপাতিত হয়ে বিশুদ্ধ ধারণা রূপে আমাদের বোধের জগতে স্থান পায়। আজকের দিনের গাণিতিক স্বীকৃতি ও যৌক্তিক নীতিগুলির পিছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। গোড়ায় মানুষ নিশ্চই খুব মোটা দাগের কিছু স্বীকৃতি ও কিছু যৌক্তিক নীতির ভিত্তিতে নিজেদের ভিতর অভিজ্ঞতা ও তথ্যের আদান-প্রদান করত (স্বীকৃতি ও যৌক্তিক নীতি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সদা-সর্বদাই ব্যবহার করি, কিন্তু সেগুলি গাণিতিক বিচারে খুবই অনুপযোগী, এবং অনেক সময়ই সেগুলি আমাদের নানান স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়), এবং এগুলিই ক্রমশ শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর রূপ পেয়ে আজকের দিনের গণিতের মৌলিক উপাদানে পরিণত হয়েছে। তাই, এই মৌলিক উপাদানগুলি নিয়েই গাণিতিক ও দার্শনিকদের ভিতর যত মতান্তর, কারণ এগুলি 'ঈশ্বরদত্ত' নয়, তাই এগুলি নিয়ে আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনার কোন শেষ নেই । যে দীর্ঘ, জটিল, ও বিসর্পিল প্রক্রিয়ায় বহির্জগৎ থেকে পাওয়া নানান অভিজ্ঞতা ঊর্ধপাতিত হয়ে গণিতের মৌলিক ধারণা রূপে আমাদের বোধ-তন্ত্রে স্থান পেয়েছে সেটি যে নির্বিকল্প, নিখুঁত, ও চূড়ান্ত, তার নিশ্চয়তা কী। বস্তুত, চিরায়ত গণিতের পাশাপাশি বোধ-বাদী তথা নির্মাণ-বাদী গণিতের অবস্থান সে রকমটাই বলে।

তবে, একই ব্যাপার একটু অন্য ভাবেও দেখা যায় - গোয়েডেল যে ভাবে দেখতেন। গোয়েডেল কিন্তু প্লেটো-বাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গণিতের সত্যগুলিকে নির্বিকল্প, নিখুঁত, ও চূড়ান্ত বলেই মনে করতেন, কারণ তারা সেই সুদূর জগতের অধিবাসী যেখানে বাস্তব জগতের ধুলো-বালির কোন স্থানই নেই । তাঁর মতে, একজন বিজ্ঞানী যখন বাস্তব জগতের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য, সে জগৎ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে তত্ত্ব গঠন করেন, তখন তার ভিতর ভুল থাকতেই পারে, তা থেকে এটা বলা যায় না যে বাস্তব জগতের সত্যগুলির ভিতর ভুল বা অসম্পূর্ণতা রয়েছে, বা বাস্তব জগৎটাই নেই । গাণিতিক সত্য সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য

বলে তিনি মনে করতেন। যেমন, অবিচ্ছিন্নতার অনুমানটি ঠিক না ভুল, সে বিষয়ে একদিন না একদিন একটা মীমাংসা হবেই - আজ সে মীমাংসা হতে পারছে না, কারণ আমরা স্বীকৃতিগুলির একটা চূড়ান্ত ও সঠিক তালিকা আজও স্থির করে উঠতে পারি নি, আমাদের অন্তর্দৃষ্টি পুরোপুরি স্বচ্ছ নয়, তাই সেই সুদূর গাণিতিক জগতের উপযুক্ত বর্ণনা দেওয়া আমাদের সাধ্যে কুলোচ্ছে না।

আগেই বলেছি, দুটি দৃষ্টিকোণের ভিতর মীমাংসা হওয়া খুব সহজ নয়, কারণ দৃষ্টিকোণ সর্বদাই অভিজ্ঞতাকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করে নেয় (রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা সর্বদাই এটা লক্ষ করি) - বস্তুত 'অভিজ্ঞতা' ব্যাপারটাই অনেক পরিমাণে দৃষ্টিকোণ-সাপেক্ষ। তাই, প্লেটো-বাদ না বোধ-বাদ, এ বিষয়ে কোন মতামত দেওয়ার জন্য আমার এই নিবন্ধ নয় (অবশ্য স্বভাব-বাদ এই দুইয়ের ভিতর বোধ-বাদের প্রতি একটু বেশি বিরূপ)। বরং এটাই বোঝা দরকার, 'এটা ঠিক' না 'ওটা ঠিক' এ ভাবে পক্ষাবলম্বন করারই কোন অর্থ নেই, কারণ গণিত-দর্শন মানে কিন্তু এমন কোন চূড়ান্ত বিধান বা রায় দেওয়া নয়, যে গণিত ব্যাপারটা 'আসলে' এই। গণিত মানুষের একটা বোধ-ভিত্তিক ও বৌদ্ধিক প্রয়াস - সেই প্রয়াসকে বাইরে থেকে নানান দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী নানাভাবে দেখা যায়, এবং নানাভাবে দেখা দরকার, কারণ তবেই কোন একটা সার্বিক (বা, বলা চলে, সর্বগ্রাসী) দর্শনের ভিতরকার অসঙ্গতিগুলো ধরা পড়ে - এই ভাবেই এগিয়ে চলে গণিত-দর্শন ও জীবন-দর্শন।

তিন।।

বস্তু-জগৎ ও ধারণার জগৎ।।

গণিতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক কী, সে প্রশ্ন শুধু যে স্বভাববাদীরাই তুলে থাকেন তা কিন্তু নয়। অভিজ্ঞেয়তাবাদী (empiricist) দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল খুবই জোরালো ভাবে তুলেছিলেন এ প্রশ্ন। মিলের মতে, গণিতের সবটাই শেষ বিচারে বহির্জগতের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া । এখানে 'শেষ বিচারে' কথাটি অবশ্য একটু বিভ্রান্তিজনক, তবে মিলের মতে, বহির্জগৎ থেকে গণিতকে বিচ্ছিন্ন করে কিছু বলারই কোন অর্থ নেই, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই গণিতও অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক কুয়াইনের গণিত বিষয়ে অবস্থানও অনেকটা মিলের

কাছাকাছি, তবে কুয়াইন ছিলেন গণিতে স্বভাব-বাদী দৃষ্টিকোণের প্রবক্তা (মিলকে এক অর্থে স্বভাব-বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্বসূরী বলা যেতে পারে), আবার তিনি গণিতে বাস্তবতা-বাদেরও আংশিক সমর্থক ছিলেন। কুয়াইনের অবস্থান মিলের কাছাকাছি ছিল এই কারণে যে তিনি মনে করতেন, গণিত বিজ্ঞানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, বিজ্ঞানের মতই গণিতের লেন-দেনও বহির্জগতের সঙ্গে, তবে গণিতের সত্যগুলি বিজ্ঞানের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। আরো সাম্প্রতিক পর্যায়ে দার্শনিক ফিলিপ কিচার স্বভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গণিতের জ্ঞান-তত্ত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্বের নিবিড় সম্পর্কের কথা বলেছেন। কিচার মনে করেন গণিত কোন চূড়ান্ত অর্থে স্বতঃপ্রতীত নয় এবং একই সঙ্গে একথাও বলেন যে "গণিত নিজেই তার নিজের বিষয়বস্তু সৃষ্টি করে" (কিচারের গণিত-দর্শন গণিতের ইতিহাস-সংপৃক্ত; সূত্র [Kit] দ্রষ্টব্য)। গণিতে স্বভাববাদী দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা পিনেলপি ম্যাডি গণিত-শাস্ত্রের স্বয়ংসম্পূর্ণতায় অনেকটাই বেশি বিশ্বাসী, তবে গোয়েডেলের মতই তিনিও মনে করেন, গণিতের মৌলিক স্বীকৃতিগুলি চূড়ান্ত নয়, যেমন, সমাহার-তত্ত্বে ZFC-র স্বীকৃতিগুলিই শেষ কথা, এ কথা বলা চলে না। আবার, গোয়েডেলের তুলনায় ম্যাডির অবস্থান একটু ভিন্ন, কারণ ম্যাডি মনে করেন, স্বীকৃতিগুলি শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে তা কোন লোকোত্তর জগতের পূর্ব-নির্ধারিত সত্য দ্বারা নির্ধারিত হবে না, নির্ধারিত হবে গাণিতিকদের নিরন্তর চর্চা ও তাঁদের ভিতর নিরন্তর আদান-প্রদান দ্বারা - দর্শন বলে দেবে না গণিত কোন দিকে যাবে, কারণ গণিত-চর্চা নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক, ঠিক যেমন বিজ্ঞান-চর্চা নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক (ম্যাডি স্বভাব-বাদকে 'দ্বিতীয় দর্শন' বলে উল্লেখ করেন; সূত্র [Ma1], [Ma2])।

কুয়াইন স্বভাব-বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে গাণিতিক-দার্শনিক হিলারী পুটনামের (1926-2016) সঙ্গে একত্রে বিজ্ঞানের সাপেক্ষে গণিতের 'অপরিহার্যতার যুক্তি' (indispensability argument) প্রয়োগ করে গাণিতিক সত্যগুলির 'অস্তিত্ব' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্য, বস্তুত, প্লেটো-বাদী অস্তিত্ব-তত্ত্বের প্রতি সমর্থন যোগায়, এবং সমাহার-তত্ত্বের স্বীকৃতিগুলি শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে সে বিষয়ে কিছু অগ্রিম ইঙ্গিত রাখতে চায়। ম্যাডি এই ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করতে চান, কারণ তিনি মনে করেন দার্শনিক অবস্থান থেকে গণিত সম্পর্কে অগ্রিম কিছু বলা অভিপ্রেত নয়।

গণিতে স্বভাব-বাদী দৃষ্টিকোণটির একটি পর্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সুত্র [SEP] ।

মিল, কুয়াইন, কিচার বা ম্যাডির দর্শনের ঠিক-ভুল বিচার আমার এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কারণ সে সাধ্য আমার নেই। বরং আমি বলব, এঁদের সকলেরই মতের ভিতর কিছু দিক আছে যা গ্রহণযোগ্য, আবার কিছু দিক নিয়ে চিন্তার অবকাশ থাকতেই পারে। তবে কি গণিতের একটা শুদ্ধ ও নিটোল দর্শন বলে কিছু থাকবে না? এটাও কিন্তু একটা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার - দর্শন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী। আমি জানি না, গণিতকে বাইরে থেকে দেখার ও বোঝার জন্য একটামাত্র সর্বাত্মক দর্শন ভাল কি খারাপ, তবে, যদি ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক অবস্থানের ভিতর থেকে গ্রহণযোগ্য দিকগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলির সাহায্যে একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে গণিতকে দেখা যায়, তাই বা মন্দ কী? বস্তুত, সেও ত এক দর্শন!

যেমন, স্বভাব-বাদী দৃষ্টিকোণ - যদি ভাবা যায়, স্বভাব-বাদই শেষ কথা, এটা ছাড়া গণিতকে বোঝা সম্ভবই নয়, তবে আমার মনে হয়, সেটা একটু একটু অতিরিক্ত দাবী করা হবে। আর, যদি মনে করা যায় যে গাণিতিক সত্যগুলি মানুষের বৌদ্ধিক চর্চার ফল, সেগুলির অবস্থান আমাদের ধারণার জগতে, তবে তা হবে স্বভাব-বাদী চিন্তার একটি গ্রহণযোগ্য দিকের স্বীকৃতি (অর্থাৎ স্বভাব-বাদের সঙ্গে বোধ-বাদের মৌলিক বিরোধ রয়েছে, এ কথা ভাবার কারণ নেই)।

আমরা যখন গণিতের সঙ্গে ‘বহির্জগৎ’-এর সম্পর্কের কথা ভাবি তখন সাধারণত বহির্জগৎ বলতে তার ভিতর আমাদের ধারণার জগৎটিকে ধরি না । ধারণার জগৎ বা চিন্তা-ভাবনার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়াকে সাধারণত ‘ভাব-বাদ’ আখ্যা দেওয়া হয়। আমরা যেটাকে ‘বস্তুজগৎ’ বলে ভাবি, সেটির আমাদের ভাবনা-চিন্তার উপর নির্ভর করে না, এই অবস্থান থেকে শুরু করে আমরা ধারণার জগৎটিকে ‘গৌণ’ বলে মনে করি। অথচ ধারণার জগৎটি সে অর্থে গৌণ নয়, কারণ তথাকথিত বস্তুজগৎ আমরা কিন্তু দেখি বা অনুভব করি আমাদের বহুবিধ পূর্ব-অর্জিত ধারণার মাধ্যমেই - কোন বস্তুকে আমরা যখন দেখি বা তার সম্পর্কে নানাভাবে জ্ঞান অর্জন করি, তখন কিন্তু সেটি ‘আসলে’ যা, আর আমরা তাকে যেভাবে অনুভব করি, তার ভিতর দুস্তর পার্থক্য থেকে যায়। বস্ত ‘আসলে’ যা, আর বস্তু আমাদের ধারণায় যা, তার ভিতরকার এই পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন কান্ট, এবং এ ভাবেই কান্ট ‘বস্তুবাদ’ আর ‘ভাববাদ’-এর দ্বৈরথে যোগ করেছিলেন নতুন মাত্রা। যে কোন বস্তুই অসীম-মাত্রিক, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, তার এক খন্ডিত অংশেরই নাগাল পাই । যেটুকু পাই তাই নিয়েই গড়ে তুলি আমাদের ধারণার জগৎ।

বিশ্বজগতের অসংখ্য বস্তুর ভিতর অসংখ্য ধরনের সম্পর্ক আমাদের বোধে ও বুদ্ধিতে যেভাবে ধরা পড়ে, তাই নিয়ে গড়ে ওঠে নানান ধারণা; আবার ধারণাগুলি পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে ক্রমশ প্রসারিত করে অসংখ্য ধারণার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সুদূর-বিস্তৃত ধারণার জগৎটিকে। মানুষের বোধ-বৃত্তির এক বিশেষ গুণ হল, এটি কিছুটা পরিমাণে আত্ম-সমীক্ষণে সক্ষম - আমরা আমাদের ধারণার জগৎটিকে পর্যবেক্ষণ করে নতুন ধারণা গড়ে তুলতে পারি, ধারণাগুলির ভিতর নানান সম্পর্ক স্থাপন করে সেগুলিকে আরো বিচিত্র ও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারি, এবং প্রয়োজনে সেগুলির সঙ্গে আবার বস্তু-জগতের সম্পর্ক বিচার করতে পারি।

স্বভাব-বাদ যখন গণিতের দর্শন প্রসঙ্গে বিমূর্ত চিন্তা ছেড়ে অনুসন্ধানের গুরুত্বের কথা বলে, তখন তা অনেকটা অকথিত ভাবেই বস্তুজগৎ সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে গণিতের তাৎপর্য বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করে, কারণ এ বিষয়টি বহু দিন ধরেই দার্শনিকদের ভাবিত করেছে। সে তুলনায় আমাদের ধারণার জগতে গণিতের অবস্থান বিষয়ে মনোযোগ বরাবরই কিছুটা কম। পপার থেকে শুরু করে ম্যাডি, অনেকেই বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক ভাবনায় ‘মনস্তত্ত্ব’-এর ভূমিকার কথা বলেছেন, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান গণিতের প্রকৃতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে কত গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের ধারণার জগতে গাণিতিক সত্যগুলি কিভাবে আবির্ভূত হয় সে বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানের তাৎপর্য কতটা, তার স্বীকৃতি একান্তই মৌখিক এবং আলগা।

অবশ্য, গণিতকে আমাদের ধারণার জগতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখার মানসিকতায় একটি সম্ভাব্য বিপদের কথা বলে গাণিতিক বাস্তবতাবাদ - মানুষের ধারণা ত ব্যক্তিভেদে ভিন্ন, ধারণাগুলি ত সদা-সর্বদা পরিবর্তিত হতে হতে চলেছে - তা হলে গাণিতিক সত্যগুলি এত অমোঘ ও অলঙ্ঘ্য হয় কি করে। গাণিতিক সত্যগুলি যদি ব্যক্তিনির্ভর হত, সেগুলি যদি সর্বদা পরিবর্তনযোগ্য হত তবে ত গণিত আর গণিত থাকত না । তবে বাস্তবতা-বাদের এই আশঙ্কাও কিন্ত পুরোপুরি বাস্তবানুগ নয় । ব্যক্তির অর্জিত ধারণা, আর কোন গোষ্ঠী বা সমষ্টি কর্তৃক স্বীকৃত বা গৃহীত ধারণা এক নয়। আমাদের ধারণাগুলির ভিতর চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে নিরন্তর আদান-প্রদান - কিছু ধারণা ক্রমশ উন্নীত হয় সর্বজনীন পর্যায়ে, এবং শেষ পর্যন্ত তা লিখিত, মুদ্রিত বা অন্য কোন মাধ্যম অবলম্বন করে বিশ্বজনীনতার স্বীকৃতি পায়। অতীতে পৃথিবীর বহু জায়গায় গণিতের বহু জটিল সত্য আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু তাদের

অনেকগুলিই ছিল শ্রুতিনির্ভর, তাই সেগুলি ছিল স্থান-কালে সীমাবদ্ধ, তাদের ভিতর যেগুলি লিখিত আকারে স্থায়ী হতে পেরেছিল সেগুলিই আজকের দিনের গণিতের অঙ্গীভুত হয়েছে, যা অমোঘ, অলঙ্ঘ্য, ও বিশ্বজনীন, যা ব্যক্তি-নির্ভর নয়, সদা-পরিবর্তনীয়ও নয়। অর্থাৎ, ধারণার একটা বিবর্তন আছে, সেই বিবর্তনের পথ ধরেই তা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব জগৎ থেকে ক্রমশ উত্তীর্ণ হয় বিশ্বজনীন, অমোঘ, ও অলঙ্ঘ্য ধারণার জগতে । বৈজ্ঞানিক ধারণারও বিবর্তন ঘটে একই ভাবে, তবে গণিতের ধারণার মত সেগুলি অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী নয়। গণিতের জগৎ আর বিজ্ঞানের জগৎ, এই দুইয়ের ভিতর সম্পর্ক নিয়ে এবারে অল্প আলোচনা করব।

> ধারণার জগৎটিকে একটি অসংখ্য-মাত্রিক মন্ডল বা space বলে ভাবা যায়, যেখানে নানান ধারণার বিচিত্র সমন্বয়ে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন ধারণা, এবং এইভাবে ধারণা-মন্ডলটির গঠন ক্রমশ সমৃদ্ধ হচ্ছে। বিজ্ঞানে, গণিতে এবং অন্যবিধ বিষয়ে সৃজনী-চিন্তার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে মার্গারেট বোডেন (সূত্র [Bo]) এই ধারণা-মন্ডলের কথা আলোচনা করেছেন। ধারণা-মন্ডল বিষয়ে গাণিতিক আলোচনা ও চর্চা শুরু করেন পিটার গার্ডেনফর্স (সূত্র [Ga]), যা ব্যাপ্তি-অনুমান ও কৃত্রিম-মনন বিষয়ক অনুসন্ধানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চার।।

গণিত ও বিজ্ঞান ।।

নোবেল-জয়ী গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানী ইউজীন ভিগ্নারের (1902-1995) একটি বহু-পঠিত নিবন্ধের শিরোনাম ছিল ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে গণিতের যুক্তি-বহির্ভূত কার্যকারিতা’ (The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences) । এখানে unreasonable effectiveness বলতে ভিগ্নার প্রশ্ন তুলেছেন, গণিতের জগৎ প্রাকৃতিক জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিতে গণিত এত কার্যকর ভূমিকা পালন করে কীভাবে? গণিত যদি বিশেষ এক ধরনের মানসিক নির্মিতি হয় তবে বস্তুজগতের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে তা আমাদের সাহায্য করে কীভাবে ? অনেক সময়ই দেখা যায়, বিজ্ঞানীরা যখন অতি জটিল কোন বিষয় নিয়ে বিভ্রান্ত বোধ করছেন, তখন তাঁরা গণিতের ভান্ডারে খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বিষয়ে কিছু না জেনেও গাণিতিকরা বহু

আগেই এমন কিছু গাণিতিক তত্ত্ব নির্মাণ করে রেখেছেন যেগুলি ঐসব জটিল প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা যুগিয়ে দিচ্ছে। গণিতের এই ভূমিকা, আপাতদৃষ্টিতে, যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না। শুধু ভিগ্‌নারই নন, বহু প্রথম সারির বিজ্ঞানী ভিগ্নারের মতই বিভ্রান্ত বোধ করেছেন গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে (সূত্র [Sh] দ্বিতীয় অধ্যায়, [Co] ষষ্ঠ অধ্যায়)।

গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক সত্যিই সহজবোধ্য নয়, এবং এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত কথা সম্ভবত কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। তবে প্রাথমিক ভাবে কয়েকটি কথা ভেবে দেখা যেতেই পারে। গণিতের অবস্থান আমাদের ধারণার জগতের ঊর্ধতম কোন এক স্তরে, এ কথা যেমন ঠিক, তেমনই আবার এ কথাও ঠিক যে গণিত, বস্তুজগতের অভ্যন্তরস্থ অসংখ্য বিচিত্র সম্পর্ক আর একই সঙ্গে ধারণার জগতের ভিতরকার নানান সম্পর্কের এক প্রায়-অলৌকিক ঊর্ধপাতন। গণিতের কারবার নানান সম্ভাব্য সম্পর্ক নিয়ে, যা বাস্তবে আছে কি নেই সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, সেই সম্পর্ক কল্পনা করা হচ্ছে বাস্তব নানান সম্পর্কের সূত্র ধরে। যেমন একটি জ্যামিতিক চিত্রকে একটা বিশেষ কোণ ধরে ঘুরিয়ে দিলে সেটি অপর একটি জ্যামিতিক চিত্রের সঙ্গে মিলে যায় । এবারে ঐ কৌণিক ঘূর্ণনকেই একটা বিষয় হিসেবে ধরে অপর একটি কৌণিক ঘূর্ণনের সঙ্গে সেটি প্রযুক্ত হলে দুইয়ের মিলিত ফল কি সেটি বিচার করা যেতে পারে, কারণ বাস্তবে দেখা যায়, দুটির মিলিত ফল দাঁড়ায়, ভিন্ন এক কৌণিক ঘূর্ণন । এবারে এই প্রারম্ভিক যোগসূত্র থেকে শুরু করে তারপর কল্পনায় বিভিন্ন কৌণিক ঘূর্ণনের ভিতরকার সম্পর্কটিকে ঊর্ধপাতিত করে, এবং অন্যবিধ গাণিতিক চিন্তার সাহায্য নিয়ে নির্মিত হয় যূথতত্ত্ব (group theory), যেখানে যূথ বা group-এর ভিতরকার সম্পর্ক ঐ ঘূর্ণনগুলির সম্পর্কের অনুরূপ। ব্যস্, এখানেই কিন্তু যূথতত্ত্ব আর বাস্তব জগতের ভিতর সম্পর্ক শেষ (আমি এখানে একটি অতি-সরলীকৃত ভাষ্য দিচ্ছি মাত্র, যা থেকে গণিত ও বাস্তব জগতের ভিতরকার সম্পর্কের একটা অন্তত আবছা আভাস পাওয়া যায়), কারণ এর পর কিন্তু ধারণার জগতে একের পর এক নানান নির্মিতি শুরু হবে, যূথ-তত্ত্ব পৌঁছবে এক অবিশ্বাস্য উচ্চতায় - যূথতত্ত্বের সীমানার ভিতর আরো বহুবিধ বিচিত্র সম্পর্কের খোজ পাওয়া যাবে, একটা স্তরীভূত জালকের মত। ওদিকে, বাস্তব জগতেও কিন্তু কৌণিক ঘূর্ণনের অনুরূপ আরো বহুবিধ সম্পর্ক রয়েছে, যেমন চলন বা translation (দুটি চলনের ভিতর সম্পর্ক, একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, দুটি ঘূর্ণনের মতই), আর এই সব সম্পর্কগুলিও কিন্তু একটা জটিল জালকের আকারে বিধৃত। যূথতত্ত্বের কাজ হল, একটি বিশেষ ধরনের সম্পর্কের যত রকম সম্ভাব্য ফলশ্রুতি হতে পারে তার হদিশ নেওয়া।

ফলত, কৌণিক ঘূর্ণন বা চলন ছাড়াও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিন্নতর ক্ষেত্রে গাণিতিক যূথতত্ত্ব কার্যকর হতেই পারে, যদিও সেই সব ক্ষেত্রের কথা মাথায় রেখে কিন্তু যূথতত্ত্ব নির্মিত হয় নি, যূথতত্ত্ব নির্মিত ও বিকশিত হয়েছে গণিতের আপন নিয়মে, যেখানে নিরন্তর ঘটে চলে বিমূর্ত ও সামান্যীকৃত ধারণাগুলির নানান সম্ভাব্য সমন্বয়।

একটি অন্য ধরনের দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি হয়ত আর একটু পরিষ্কার হতে পারে (অবশ্য আমার কাছেও যে খুব একটা পরিষ্কার, তা একদমই নয়)। মনে করা যাক, কোন চিত্রকর একের পর এক মানুষের মুখ এঁকে চলেছেন,এবং তিনি মুখমন্ডলের ভিতর চোখ, নাক, কান এই সবের সংস্থাপন করে চলেছেন নির্দিষ্ট কিছু সূত্র মেনে (কান থাকবে মুখমন্ডলের দুই পাশে, চোখ দুটি থাকবে কপালের নিচে, ইত্যাদি), কিন্তু ঐ সব সূত্র মাথায় রেখে এবারে যতরকম সংস্থাপন সম্ভব একের পর এক সেগুলি চিত্রায়িত করে চলেছেন তিনি, আপন মনে, আপন খেয়ালে। এবারে বাস্তব জগতে বিভিন্ন মানুষের মুখের কথা যদি ভাবা যায়, সেগুলিও ওই সব সূত্রের বিধান মেনেই মূর্ত হয়েছে, কিন্তু তবু মানুষের মুখের ভিন্নতার কোন সীমা নেই। এখন, কোন একজন বিশেষ মানুষের কথা যদি ধরা যায় তবে হয়ত দেখা যাবে, ঐ মানুষটির মুখ চিত্রকরের আঁকা কোন একটি মুখের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে, যদিও চিত্রকর ছবি এঁকেছেন আপন খেয়ালে, ঐ মানুষটিকে তিনি হয়ত কোনদিন দেখেনই নি।

তা হলে, এক অর্থে, গণিত হল সম্ভাব্য সব রকম সম্পর্কের বিষয়ে ধারণা গঠন। এই ধারণা গঠনের প্রক্রিয়ায় গণিত প্রত্যক্ষভাবে বহির্জগতের কথা ভাবে না। যখন বহির্জগতের কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন গাণিতিক ধারণা গঠিত হয়, তখনও প্রথমে সাধারণভাবে (অর্থাৎ, গাণিতিক শুদ্ধতায় নয়) ধারণা গঠিত হয়, ও তার পর সেই ধারণাটি ঊর্ধপাতিত হয়ে গাণিতিক শুদ্ধতা লাভ করে। তাই গণিত পুরোপুরি ধারণার জগতের ব্যাপার, এ ভাবে বললে বোধ হয় খুব একটা ভুল হবে না। বিপরীতে, বিজ্ঞানের কাজ বহির্জগৎ নিয়ে (যদিও, এই 'বহির্জগৎ'-এর ভিতর ধারণার জগৎকেও ধরতে হবে কারণ মনোবিজ্ঞানের কাজ ধারণার জগৎ নিয়েই), তবে বিজ্ঞানও কিন্তু বহির্জগৎকে দেখে ধারণার মাধ্যমে - বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধারণাগুলি এক একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রূপে নির্মিত হয়। কোন বিজ্ঞানী যখন যন্ত্রপাতি নিয়ে কোন পরীক্ষা করেন, তখনও সেই পরীক্ষার ফলগুলি তিনি বিশ্লেষণ করেন কোন না কোন পূর্ব-গঠিত তত্ত্বের কাঠামোর ভিতর (এ

প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নরউড রাসেল হ্যানসন (1924-1967); সূত্র [La], চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) । এর পরেও কথা আছে। বিজ্ঞানের যে কোন শাখায় বিজ্ঞানীরা যখন কোন তত্ত্ব গঠন করেন, তখন সর্বদাই তাঁরা সেটা করেন বহির্জগতের কোন এক অংশকে (যেমন, কিছু সংখ্যক মৌল কণিকা, বা বহুসংখ্যক অণু সহযোগে গঠিত কিছু পরিমাণ গ্যাস, বা প্রাণীদেহের কোন একটি কোষ) কল্পনায় বা বাস্তবে বিশ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। শুধু তাই নয়, যে কোন বস্তুই যেহেতু অসীম-মাত্রিক, তাই বিজ্ঞানীরা বস্তু বা বস্তুপুঞ্জের কিছু সংখ্যক গুণের উপর দৃষ্টিপাত করেন, তাঁদের তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব গুণের তাৎপর্য কম, সেগুলিকে তাঁরা অগ্রাহ্য করেন । এইভাবে তাঁরা তৈরী করেন তাঁদের গবেষণাধীন বস্তু বা বস্তুপুঞ্জের একটি সরলীকৃত প্রতিরূপ বা model - যেমন, কোন গ্যাসের ধর্ম বর্ণনা করার জন্য, অনেক সময় গ্যাসের অণুগুলিকে বিন্দুবৎ কণা রূপে ভাবা হয়, অথবা দ্বি-আণবিক গ্যাসের বেলায় শুধুমাত্র অণুগুলির কম্পন- বা ঘূর্ণন গতির কথা ভাবা হয়, অণুর ভিতরকার ইলেকট্রনগুলির বিভিন্ন সম্ভাব্য দশার কথা ভাবা হয় না । এইভাবে বহির্জগতের কোন এক অংশের প্রতিরূপ তৈরী করে তাঁরা উপযুক্ত আসন্নায়নের (approximation) মাধ্যমে বহির্জগতের একটা ছবি ফুটিয়ে তোলেন, এবং এই ছবি বস্তুত কিছু ধারণার সমন্বয়, যা কোন এক আংশিক বা পূর্ণ তত্ত্ব রূপে স্বীকৃতি পায়।

এখন, এই প্রতিরূপ কিন্ত একটি গাণিতিক ধারণার সমতুল্য, কারণ এটি কল্পিত, যদিও গাণিতিক ধারণার সঙ্গে এর বড় তফাৎ হল,এটি বাস্তব জগতের কোন অংশের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। তবে গণিতেও কিন্তু প্রতিরূপের বড় ভূমিকা আছে: আমরা আগেই দেখেছি, কোন যৌক্তিক ভাষার যে কোন বিবৃতির সত্যতা নির্ধারিত হয় কোন এক বা একাধিক সমাহারের সাপেক্ষে - কোন সমাহারের সাপেক্ষে বিবৃতিটি সত্যি হলে, ঐ সমাহারটিকে বিবৃতির সাপেক্ষে একটি প্রতিরূপ (model) বলা হয় (সূত্র [Le] প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। প্রতিরূপ বিবৃতির সত্যতা নির্ধারণ করে বিবৃতিকে একটি অবয়ব দিয়ে। এবারে ভাবা যাক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ব্যবহৃত একটি প্রতিরূপের কথা - এই (বৈজ্ঞানিক) প্রতিরূপটি গঠিত কিছু ধারণা সহযোগে, যেগুলির ভিতর গণিতের কোন উপযুক্ত যৌক্তিক ভাষা (যেমন, যূথতত্ত্বের ভাষা) অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে, এবং (বৈজ্ঞানিক) প্রতিরূপটি যে সকল বস্তু বা বস্তুপুঞ্জের আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য গঠিত হয়েছে সেগুলি (অথবা তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ধারণাবলী) সহযোগে একটি সমাহারের কথাও ভাবা যেতে পারে । ঐ সমাহারটি এবারে যদি কিছু গাণিতিক বিবৃতির সাপেক্ষে (গাণিতিক) প্রতিরূপের কাজ করে তবে বলা যেতে পারে, গাণিতিক বিবৃতিগুলি একটি বৈজ্ঞানিক

তত্ত্বের উপাদান, যে তত্ত্ব বিশ্বজগতের কোন এক অংশের আচরণ ব্যাখ্যা করছে। লক্ষ করা যেতে পারে, গাণিতিক বিবৃতির সত্যতা নির্ধারিত হচ্ছে প্রতিরূপটির সাপেক্ষে, যেটি একযোগে একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিরূপ, আবার গাণিতিক প্রতিরূপও বটে। আর, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সত্যতা নির্ধারিত হচ্ছে বিশ্বজগতের আচরণের সাপেক্ষে যা, বস্তুত, আমাদের ধারণার জগতের বাইরে । অর্থাৎ, গাণিতিক সত্যতা, যা নির্ধারিত হয় গণিতের নিজস্ব উপায়ে, বৈজ্ঞানিক সত্যতার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকতে পারে কারণ উভয়েরই অবস্থান আমাদের ধারণার জগতে, যেখানে সব রকম ধারণার ভিতর অন্বয় সম্পাদিত হওয়া সম্ভব।

গাণিতিক সত্যতা যাচাই হয় গাণিতিক প্রমাণের দ্বারা, আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সত্যতা যচাই হয়, অংশত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা, আর অংশত গাণিতিক প্রমাণের দ্বারা। দুই ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, সত্যতা আর যাথার্থ্য এক নয়, দুইয়ের ভিতর পার্থক্য আছে । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য সুবিদিত - বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কখনই সত্যকে পুরোপুরি উদ্ঘাটিত করতে পারে না । আর, গণিতের ক্ষেত্রে, এই পার্থক্য বিতর্কের বিষয়।

> কোন এক বৈজ্ঞানিক প্রতিরূপের ভিতর যে গণিত-নির্ভর সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব নির্মিত হয় তা ব্যত্যয়-হীন, কিন্তু, বস্তুত, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে সে তত্ত্ব চূড়ান্ত নয়, কারণ তা নির্মিত হয়েছে প্রাকৃতিক বাস্তবতার এক খন্ডিত অংশের অল্প কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য ধরে, বাস্তবতার বহুসংখ্যক (বস্তুত, *অসীম* সংখ্যক) মাত্রা অগ্রাহ্য করে। তাই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সত্যতার ধারণাটি জটিল, কারণ এই সত্যতা আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনযোগ্য। বিশেষত, প্রাকৃতিক বাস্তবতা সম্পর্কিত অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটটি পর্ব থেকে পর্বান্তরে বদলে যায় নাটকীয় ভাবে, যেখানে পর্বান্তরের আগের ও পরের তত্ত্বের গড়ন অনেকটাই ভিন্ন হয়ে যায়। এর কারণ, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দায়বদ্ধতা শুধু কোনো এক প্রতিরূপের ভিতরই সীমিত নয়, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দায়বদ্ধ বিশ্বজগতের কাছে - তাকে ক্রমাগত পরের পর পরীক্ষায় পাশ করতে হয়, যেখানে প্রতিনিয়ত অসংখ্য প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে বলা হয় তাকে। গাণিতিক সত্যতা সে তুলনায় জটিলতাহীন, কারণ গাণিতিক প্রতিরূপ বা নির্দিষ্ট তত্ত্বীয় কাঠামোর বাইরে তার পরীক্ষা নিতে বসে নেই বিশ্বজগৎ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠাও তাই শর্তাধীন, আর গাণিতিক সত্যতার যাচাই নিঃশর্ত। অবশ্য, গাণিতিক সত্যতার *তাৎপর্য* বিচার সহজ নয় - বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাৎপর্য ভিন্ন হয়ে যায়।

এর আগে আমরা দেখেছি, গণিতের অবস্থান আমাদের ধারণার জগতে, এই ভাবনা প্লেটো-বাদের বিপরীতে বোধ-বাদেরই বেশি কাছাকাছি। এখন আবার দেখা যাচ্ছে, চিরায়ত গণিত যখন সত্যতা আর যাথার্থ্যের ভিতর ব্যবধানের কথা বলে, আর বোধ-বাদ যখন সেই ব্যবধান অস্বীকার করে, তখন চিরায়ত গণিতের ভাবনাকে ভুল বলার জায়গা নেই - এই ব্যবধান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে সত্যতা আর যাথার্থ্যের ভিতরকার ব্যবধানের অনুরূপ। বস্তুত, চিরায়ত গণিতে আর বোধ-বাদে সত্যতার ধারণাই ভিন্ন - তাই দুইয়ের ভিতর কোনটি ঠিক কোনটি ভুল, তা বলার তাৎপর্য নেই।

হিলবার্টের প্রকল্প যখন চিরায়ত গণিত আর বোধ-বাদী গণিতের ভিতর মীমাংসায় কার্যত ব্যর্থ হয়, তখন তা থেকেও বোঝা যায়, চিরায়ত গণিত আর বোধবাদী (বা নির্মিতিবাদী) গণিতের ভিতর কে ঠিক আর কে ভুল, এ প্রশ্ন অনেকটাই অর্থহীন। দুই গণিতই আমাদের ধারণার জগতে অবস্থিত । নানান ধারণার ভিতর সম্ভাব্য অসংখ্য ধরনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে নতুন নতুন ধারণা, আর, সকল সম্ভাব্য ধারণার ভিতর থাকে নানান বিচিত্র জটিল সম্পর্ক। এই ধারণার অনন্ত-বিস্তৃত জগতেই স্থান পায় চিরায়ত গণিত, স্থান পায় নির্মিতিবাদী গণিত, এবং সেই স্থান থেকে তারা নির্বাসিত হয় না যতদিন না তাদের ভিতর কোন স্ব-বিরোধ দেখা দেয় । ইতিমধ্যে তারা কখনো হয় ত প্রযুক্ত হয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গঠনের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রতিরূপে - এক এক ধরনের গণিত এক এক ভাবে - প্রযুক্ত হয়ে তারা আমাদেরকে সাহায্য করে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে একটা আংশিক ছবি তৈরী করতে । তবে, আবার উল্লেখ করা দরকার, গাণিতিক ধারণাগুলি কিন্তু সাধারণত নির্মিত হয় গণিতের আপন গতিতে, ঠিক যেমন চিত্রকর মুখ এঁকে চলেন আপন খেয়ালে, কখনো কখনো কোন ব্যক্তির মুখের সঙ্গে তা হুবহু মিলে যায় ..... ।

আবার, এ কথাও ঠিক যে কখনো কখনো গাণিতিক ধারণা নির্মিত হয় বিজ্ঞানের প্রয়োজন মেটাতে (সূত্র [Ru] দ্রষ্টব্য), এবং তখন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও গণিত পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে চলে । বিজ্ঞানের ইতিহাসে, বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানে, এর দৃষ্টান্ত প্রচুর। যেমন, গতিবিদ্যার হাত ধরে এগিয়েছে কলনবিদ্যা (calculus), এবং প্রাথমিক অগ্রগতির পর কলনবিদ্যা থেকে শুরু করে বহুবিধ গাণিতিক তত্ত্ব নির্মিত ও বিকশিত হয়েছে গাণিতিক অনুসন্ধানের নিজস্ব পথে, গতিবিদ্যার প্রত্যক্ষ অনুষঙ্গ ছাড়াই।

পাঁচ।।

‘গণিতের ভিত্তি’, গণিত-দর্শন, ও প্রকার-তত্ত্ব ।।

এবারে ফিরে আসা যাক সেই গোড়াকার প্রশ্নে - গণিতের ‘ভিত্তি’ কী, আর তার সঙ্গে গণিতের দর্শনেরই বা সম্পর্ক কি ? গণিতের ‘ভিত্তি’ বলতে বোঝায়, কোন কোন মৌলিক উপাদান সহযোগে গণিত নির্মিত সে গুলিকে চিহ্নিত করা, এবং সেগুলি থেকে শুরু করে গণিতের সকল শাখা এবং সকল বিষয়ে যে সত্যিই পৌঁছন যায়, তা দেখান। ফ্রেইগে কিন্তু এই চিন্তা থেকেই শুরু করেছিলেন তাঁর প্রকল্প, এবং তাঁরই পথ অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত গাণিতিকেরা ZFC সমাহার-তত্ত্ব আর গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রের মূল নীতিগুলিকেই গণিতের ভিত্তি রূপে মেনেছেন - বস্তুত, এটাই চিরায়ত গণিতের দৃষ্টিকোণ। তবে চিরায়ত গণিত এ কথা কখনই বলে না যে এখানেই সব মৌলিক অনুসন্ধানের শেষ, এবারে বাকি রইল শুধু ঐ সব মৌলিক উপাদন কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন গাণিতিক সত্যে পৌঁছন - চিরায়ত গণিত আর নির্মিত-বাদী গণিত, দুই ক্ষেত্রেই অভিনব ও মৌলিক আবিষ্কার কোনদিনই স্তব্ধ হবে না, যার দরুন নতুন প্রাণের সঞ্চার হবে গণিতের এই দুই ধারায় - আগামী দিনে গণিতের কি চেহারা হবে তা নিয়ে কেউই কোন ভবিষ্যৎ-বাণী উচ্চারণ করতে পারে না। পারে না, কারণ আমাদের বোধ ও ধারণার জগৎ নিরন্তর পরিবর্তনশীল - ধারণাগুলির গঠন অতি বিচিত্র, জটিল, ও বিসর্পিল। আমাদের ধারণাগুলির গতিপ্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে আমাদের নিজেদেরই ধারণা অতি অল্প, যদিও আমাদের মনন-তন্ত্র নিজেই নিজের অভ্যন্তরস্থ ধারণাগুলিকে কিছুটা পরিমাণে সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ধরে । তাই, বোধ-বাদ যখন বলে যে চিরায়ত গণিত এমন সব ধারণা নিয়ে কারবার করে যা সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়, তখন সেই বক্তব্য ঠিক না ভুল সে বিচার প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষ নয় - আমাদের ধারণাগুলির গঠনের সাপেক্ষে যদি বিচার করা হয়, তবে ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে চিরায়ত গণিত যে সব আত্ম-উল্লেখী ও অনন্ত-আশ্রয়ী ধারণাগুলির কথা বলে, সেই ধরনের ধারণা আমাদের মনন-তন্ত্রের ভিতর সৃষ্টি হতেই পারে, এবং সেগুলি গণিতের উপজীব্য হতেই পারে । আবার যদি বিচারের মাপকাঠি এই হয় যে গণিতের উপাদানগুলি সবই আমাদের বোধগম্য হতে হবে, তখন তা হলে বোধ-বাদী গণিতের পথ অবলম্বন করাই কর্তব্য। এখানে মনে রাখতে হবে, আমাদের ধারণাগুলির গঠন ও গতিপ্রকৃতি কিন্তু পুরোপুরি আমাদের বোধগম্য নয়। গণিত সর্বদা বোধগম্যতা ধরে

এগোয় না - গণিতের কাজ হল, ধারণার জগতে যত রকম সমন্বয় সম্ভব তা পরীক্ষা করা, ধারণাগুলির ভিতর যত রকম সম্পর্ক সম্ভব সেই অনুযায়ী নতুন নতুন ধারণা তৈরী করা। এক্ষেত্রে গণিতের উপজীব্য হল ধারণাগুলির আঙ্গিক (formal) গঠন, সেই গঠনের বাইরে তারা কতটা অর্থবহ বা কতটা বোধগম্য সে বিচারে গণিত আগ্রহী নয় (এই প্রসঙ্গে হিলবার্টের গণিত-দর্শন অনুধাবনযোগ্য)। এটাই চিরায়ত গণিতের মনোভাব, তবে এই মনোভাব নিয়ে এগোতে গিয়ে চিরায়ত গণিতের দর্শন কিছু অতিরিক্ত দাবী করে বসে - সে দাবীগুলি নিয়ে দার্শনিক আলোচনা-সমালোচনা চলতেই পারে, গণিত তা নিয়ে, অন্তত প্রত্যক্ষভাবে, আগ্রহী নয়।

আমাদের ধারণার জগৎ ধরে বিচার করলে বলতেই হয়, গণিতের 'মৌলিক উপাদান' কথাটি খুব একটা অর্থবহ নয়। অনন্ত-বিস্তৃত ধারণার জালকের ভিতর কোনটি মৌলিক আর কোনটি মৌলিক নয়, সে বিচার সহজ নয়। একভাবে দেখলে বলা যেতেই পারে, গণিতের ধারণাগুলি থেকে শুরু করে ক্রমাগত অপনয়ন বা reduction-এর মাধ্যমে আমরা হয়ত শেষ পর্যন্ত ZFC স্বীকৃতি ও কিছু যৌক্তিক নীতিতে পৌঁছে যাব, বা উল্টো দিক থেকে, ঐ উপাদানগুলি থেকে শুরু করে সমগ্র গণিতের না হোক, গণিতের একটা বড় অংশের নির্মাণ সম্পন্ন করতে পারব। কিন্তু এটিও গণিতকে দেখার একটা উপায় মাত্র - এর বাইরে অন্যভাবেও গণিতকে দেখা সম্ভব, যেখানে মৌলিক উপাদান না খুঁজে গণিতের ধারণাগুলির ভিতরকার সম্পর্ক ধরে গণিতকে সামগ্রিক ভাবে দেখাটাই প্রধান গুরুত্ব পায়।

আগেই বলেছি গণিত-দর্শনের নানান ধারা-উপধারা রয়েছে । সেগুলির বিশদ আলোচনা ও পরিচিতি আমার এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কারণ তা আমার সাধ্যের বাইরে । আমার সামান্য বোধ ও বুদ্ধি মত এই নিবন্ধে বোধ-বাদী দর্শন ও প্লেটো-বাদী দর্শনের সূত্র ধরে গণিতের সঙ্গে আমাদের বোধ ও ধারণার জগতের সম্পর্ক নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চেয়েছি, এই মাত্র ।

গণিতকে *সামগ্রিক* ভাবে দেখে গাণিতিক ধারণাগুলির ভিতর সম্পর্ক নিরূপণকে প্রাধান্যের অবস্থানে বসানোর দৃষ্টিকোণটি স্বীকৃতি পায় প্রকার-তত্ত্ব বা category theory-তে। প্রকার-তত্ত্বের মুল কথা হল সম্পর্ক। কোন প্রকার-তন্ত্র বা category-র ভিতর থাকে কিছু 'বস্তু' বা সদস্য -

সেগুলি কী তার উপর কোন বিধিনিষেধ নেই - যে কোন গাণিতিক উপাদান সহযোগে গঠিত হতে পারে প্রকার-তন্ত্র, কিন্তু সেই প্রকার-তন্ত্রের পরিচয়ের মূল সূত্র হল, ঐ 'বস্তু' বা সদস্যগুলির ভিতর কিছু সম্পর্ক, যার দ্যোতক হল সেগুলির ভিতর কিছু রূপান্তরণ বা morphism - রূপান্তরণগুলি একমুখী হতে পারে, আবার দ্বিমুখীও হতে পারে, এমনকি একটি বস্ত তার নিজের সঙ্গেই কোন এক রূপান্তরণের মাধ্যমে সম্পর্কিত হতে পারে। যেমন, 'বস্তু'গুলি হতে পারে এক একটি সমাহার, আর রূপান্তরণগুলি সেক্ষেত্রে হবে দুটি সমাহারের ভিতর চিত্রান্তর (mapping বা transformation; কোন সমাহার থেকে তার নিজের ভিতর চিত্রান্তরও সম্ভব) । দৃষ্টান্তস্বরূপ {1,2,3}আর {1,4,9} এই দুটি সমাহারের ভিতর বর্গ অপেক্ষকের মাধ্যমে একটি চিত্রান্তরের সম্পর্ক ভাবা যায়, যেখানে 1-এর সঙ্গে 1, 2-এর সঙ্গে 4, আর 3-এর সঙ্গে 9 সম্পর্কিত। প্রকার-তত্ত্বের পরিধি সমাহার-তত্ত্বের তুলনায় বহু বহুগুণ বিস্তৃত এই কারণে যে, কোন প্রকার-তন্ত্রের ভিতরকার সদস্য-গুলি কী হবে তা নিয়ে আলাদা করে মাথাব্যথা নেই তার, বহু ধরনের গাণিতিক উপাদানকে উদার হৃদয়ে নিজের ভিতর স্থান করে দিতে পারে তা। আমরা আগে দেখেছি, সকল সম্ভাব্য সমাহারের সমাহার বলে কোন কিছুর বিষয়ে সমাহার- তত্ত্বে কোন আলোচনাই চলতে পারে না, কারণ সমাহার তত্ত্বের স্বীকৃতি-গুলি তা হলেই একটা স্ব-বিরোধ বাধিয়ে বসবে । প্রকার-তত্ত্ব কিন্তু অনেক বেশি উদার - সম্ভাব্য সকল সমাহার সহযোগে গঠিত যে প্রকার-তন্ত্র, সেটি নিজেই প্রশস্ততর এক প্রকার-তন্ত্রের সদস্য হতে পারে। এই ধরনের এক বা একাধিক প্রকার-তন্ত্রের ভিতর যে রূপান্তরণ, তাকে বলা হয় সাপেক্ষক (functor) । দেখা যাচ্ছে, নানান সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের ধারণার জগতে যেমন পর্যায়ক্রমিক উত্তরণ ঘটে থাকে, প্রকার-তত্ত্বেও সেভাবেই রূপান্তরণ থেকে সাপেক্ষকে উত্তরণের পথ তৈরী হয়।

প্রকার-তত্ত্বের স্রষ্টা স্যামুয়েল আইলেনবার্গ ও স্যন্ডার্স ম্যাকলেন (প্রকার' কথাটি তাঁরা নিয়েছিলেন কান্ট থেকে)। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম আবির্ভাবের পর থেকেই প্রকার-তত্ত্ব গণিতের অন্যতম প্রবল ও প্রধান ধারায় পরিণত হয়েছে। গণিতে বিমূর্তকরনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হল প্রকার -তত্ত্ব, যেখানে আপাত-বিচ্ছিন্ন নানান গাণিতিক ধ্রণার ভিতর বহুবিধ সম্পর্কই প্রধান বিবেচ্য । এই সব সম্পর্কের মূল কথা হল *সাদৃশ্য* (সাদৃশ্য, বস্তুত, বিরোধ ও ঐক্যের এক সহাবস্থান; প্রকার-তত্ত্বের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব উইলিয়াম লভিয়ের প্রকার-তত্ত্বের সঙ্গে দার্শনিক হেগেল বর্ণিত দ্বান্দ্বিকতার সাযুজ্য লক্ষ করেছেন ; [Law])। বাস্তব জীবনেও আমরা বিমূর্তকরন করি সাদৃশ্যের সূত্র ধরেই। সাদৃশ্য আর সম্পর্ক - বাস্তব জীবনে যেমন, গণিতেও তেমনই এদের গুরুত্ব অপরিসীম। সাদৃশ্য-সন্ধান আমাদের বোধ-বৃত্তির এক

মৌলিক প্রক্রিয়া। সাদৃশ্যের সূত্র ধরেই আমরা ধারণার জগতে গড়ে তুলি অভিনব নানান ধারণা - নির্মিত হয় ধারণার জটিল-গ্রন্থিত ও বহুবিস্তৃত জালক।

বিভিন্ন ধারণার ভিতর তুলনা সম্পাদন, আর সম্পর্ক ও সাদৃশ্য নিরূপণের ব্যাপারে প্রকার-তত্ত্বের উপযোগিতা, এবং এই প্রসঙ্গে ব্যাপ্তি-অনুমানের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে প্রকার-তত্ত্বের প্রযোজ্যতা আলোচিত হয়েছে সূত্র [BP]-তে। আমার এই নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সূত্রটি খুবই প্রাসঙ্গিক।

অর্থাৎ, প্রকার-তত্ত্বে গণিতের ‘মৌলিক উপাদান’ বা গণিতের ‘ভিত্তি’ বলে কোন কিছুর স্বতন্ত্র স্বীকৃতি নেই - গণিত-দর্শনে এর তাৎপর্য ভেবে দেখার মত। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, গণিতের ভিত্তি খোঁজা গণিত-দর্শনের কাজ নয়, কারণ ‘ভিত্তি’ কথাটির অর্থভেদ হতে পারে। যেমন, গণিত-দর্শনের একটি ধারার কথা এর আগে উল্লেখ করেছি - স্থাপত্য-বাদ। স্থাপত্য-বাদ বলে, গণিতের সমগ্র কাঠামোটি গঠিত নানান স্থাপত্য সহযোগে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যূথ-তত্ত্ব একটি স্থাপত্য - সকল সম্ভাব্য যূথ বা group এই স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত। আবার স্থান-তত্ত্ব বা topology আর এক স্থাপত্য, বহুবিধ স্থান-মন্ডল (topological space) এর অন্তর্ভুক্ত। স্থাপত্য-বাদ স্বতন্ত্র ভাবে সমাহারগুলির কথা ভাবে না, সেগুলির ভিতর এক এক ধরনের সম্পর্কের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত এক একটি স্থাপত্যের কথা ভাবে, এবং এই স্থাপত্যগুলির সাপেক্ষে গণিতকে বিচার করে। স্পষ্টতই, স্থাপত্যবাদ একটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী, কারণ এতে স্বতন্ত্রভাবে সমাহারগুলিকে না দেখে বিভিন্ন ধরনের সমাহার সহযোগে সংজ্ঞায়িত স্থাপত্যকে গণিতের উপাদান হিসেবে দেখা হয়। আর প্রকার-তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ আরো প্রশস্ত, কারণ এখানে স্থাপত্যগুলিকে পরস্পর-নিরপেক্ষ বলে না দেখে সেগুলির ভিতরকার নানান সম্ভাব্য সম্পর্কের কথা ভাবা হয়, এবং এর ফলে গণিতের ক্ষেত্রটি বহুগুণ বিস্তৃতি লাভ করে।

গণিতে ও দর্শনে স্থাপত্যবাদের সঙ্গে প্রকার-তত্ত্বের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে সূত্র [Aw]-তে। প্রকারতন্ত্রীয় গণিতের পরিচিতির জন্য [Lei] সূত্রটি উপযোগী।

অমর গাণিতিক আলেকজেন্ডার গ্রোতেন্ডিক (1928-2014) বীজগণিতীয় জ্যামিতি (algebraic geometry) বিষয়ে ও আনুষঙ্গিক বহু বিষয়ে যে অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছিলেন তার দরুন, এক অর্থে, আধুনিক গণিতের এক যুগান্তর সাধিত হয়েছিল। কারণ গ্রোতেন্ডিক প্রকার-তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে বীজগণিতীয় প্রকার-তন্ত্র ও জ্যামিতিক প্রকারতন্ত্রের ভিতর সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উভয়ের এক মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন, এবং এইভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যে গাণিতিক স্থাপত্যগুলি বস্তুত গণিতের এক বৃহত্তর কাঠামোর ভিতর পরস্পর-নিবদ্ধ।

> কোন দেশ-মন্ডল বা space-এর কিছু বিন্দুর স্থানাঙ্কগুলি যদি এক প্রস্থ বীজগণিতীয় সমীকরণ সাধিত করে তবে সেই বিন্দুগুলির অবস্থান হয় কোন এক বক্র-রেখা বা বক্র-তলে, অর্থাৎ ঐ বীজগণিতীয় সমীকরণগুলির সমাধান কোন এক বিশেষ জ্যামিতিক নক্সা বা গঠন সূচীত করে। বীজগণিতীয় জ্যামিতি বহুবিধ জ্যামিতিক সমস্যাকে বীজগণিতিক সমস্যায় রূপান্তরিত করে, এবং এইভাবে দুটি বিষয়কে সংশ্লিষ্ট করে।

> গ্রোতেন্ডিক সম্পর্কে তাঁর ঘনিষ্ঠ জনেদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, তাঁকে যদি কোন নির্দিষ্ট গাণিতিক সমস্যা দেওয়া হত সমাধানের জন্য, তিনি সেটির সমাধানে সাধারণত আগ্রহ দেখাতেন না । তার বদলে তিনি ওই সমস্যার নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের অনেক ঊর্ধে উঠে এমন এক প্রশস্ততর ক্ষেত্রের সন্ধান দিতেন যার ভিতর ঐ সমস্যাটির সমাধানের পথটি ফুটে উঠত স্পষ্ট ভাবে (সূত্র [AMS], পৃঃ 405)। গাণিতিক সমস্যার সমাধান বলতে বোঝায়, কোন এক প্রারম্ভিক অবস্থান থেকে শুরু করে একের পর এক অন্তর্বর্তী অবস্থানের ভিতর দিয়ে এক অভীষ্ট অবস্থানে পৌঁছন, অর্থাৎ, প্রারম্ভিক অবস্থান থেকে অভীষ্ট অবস্থান পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট পথ খুঁজে নেওয়া । যেমন, পার্বত্য প্রদেশে কোন এক গিরিপথ খুঁজে পেতে অভিযাত্রীদের লেগে যেত কয়েক দশক, অথচ বিমানে অনেক ওপর থেকে যদি দেখা যায় তখন পুরো পার্বত্য প্রদেশের সামগ্রিক ছবির ভিতর গিরিপথটি দেখা যায় স্পষ্টভাবে, আলাদা করে সেটিকে আর খুঁজে নিতে হয় না। প্রকারতত্ত্ব ঠিক এ ভাবেই বহুবিধ গাণিতিক স্থাপত্যের ভিতর সম্পর্ক স্থাপনের ভিতর দিয়ে গণিতের প্রশস্ত চিত্রপট তুলে ধরতে চায়।

এবারে এই তৃতীয় পর্বের সারসংক্ষেপের পালা। তবে তার আগে গণিত-দর্শন সম্পর্কে ভিটগেনষ্টাইনের কিছু বক্তব্যে ফিরে যাওয়া যাক। গণিত বিষয়ে লুডভিগ ভিটগেনষ্টাইনের চিন্তা-ভাবনাকে অনেকেই দুটি ‘পর্যায়’-এ ভাগ করেন - ‘প্রথম পর্যায়’-এর ভিটগেনষ্টাইন আর ‘দ্বিতীয় পর্যায়’-এর ভিটগেনষ্টাইনের ভিতর মিল বিশেষ নেই। গোড়ায় ভিটগেনষ্টাইন ছিলেন অনেকটাই

রাসেল ও সমসাময়িক দার্শনিকদের বৈশ্লেষিক দর্শন চর্চার কাছাকাছি, এবং তাঁর গণিত-দর্শনেও তার ছাপ পড়েছিল - এই প্রথম পর্যায়ের ভিটগেনষ্টাইনকে নিয়েই দার্শনিকদের আগ্রহ ছিল বেশি। কিন্তু তার পর ভিটগেনষ্টাইনের গণিত-চিন্তা ক্রমশ ভিন্ন পথে বইতে থাকল, এবং এই ভিটগেনষ্টাইনকে নিয়ে কিন্তু দার্শনিকেরা অনেকটাই দ্বিধাগ্রস্ত (কেউ কেউ মনে করেন, প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরণের পথে ভিটগেনষ্টাইন একটি 'অন্তর্বর্তী' পর্যায় অতিক্রম করেছিলেন; সূত্র [St] দ্রষ্টব্য)। অথচ এই 'দ্বিতীয় পর্যায়'-এর ভিটগেনষ্টাইনের চিন্তা কিন্ত স্বভাববাদের অনেক কাছাকাছি ([Ma], তৃতীয় পর্ব, প্রথম অধ্যায়; [IEP2]), যেখানে গণিতের কোন একটি সার্বিক 'দর্শন'-এর গুরুত্ব স্বীকার করা হয় না, বরং একতন্ত্রী দর্শনের নানান নেতিবাচক প্রভাবের দিক তুলে ধরা হয়, একতন্ত্রী দর্শন গণিতের অবাধ বিকাশ কীভাবে ব্যাহত করে সে কথা বলা হয়, গণিতের 'ভিত্তি' আলোচনার ব্যাপারে স্বতন্ত্র আগ্রহ দেখানো হয় না ।

> অবশ্য, আগেই বলেছি, স্বভাববাদকে কোন এক সুগ্রথিত দার্শনিক মতবাদ বলে ভাবা ঠিক নয় - এটি কিছু পদ্ধতিগত প্রশ্নকে সম্মুখে নিয়ে আসে এবং, বস্তুত, দর্শনকে অতিরিক্ত মহান বলে ভাবার বিরোধিতা করে, এই পর্যন্ত। স্বভাব-বাদও একটি দৃষ্টিভঙ্গী বৈ কিছু নয়। মানব-অস্তিত্বের ও জীবনের বিপুল বিস্তৃত ক্ষেত্রে অন্য সব কিছুর মতই স্বভাববাদেরও নিজস্ব জায়গা আছে, তার বেশিও নয়, কমও নয়।

গণিতে ভিটগেনষ্টাইন কোন একটি অনড় 'অবস্থান' গ্রহণ করেন নি - এটিই ছিল সম্ভবত তাঁর গণিত-ভাবনার সব চাইতে সদর্থক দিক । তিনি ছিলেন গাণিতিক বাস্তবতা-বাদের বিরোধী, গণিতে 'বাস্তবতা' বলতে যা বোঝানো হয় - অর্থাৎ লোকোত্তর এক জগৎ - তা এক অলীক বাস্তবতা । হার্ডি (1877-1947), গোয়েডেল সহ বহু বিখ্যাত গাণিতিক এই জগৎটির অস্তিত্ব স্বীকার করতেন - যদিও ভিটগেনষ্টাইন একে এক 'বিপজ্জনক ভ্রান্তি' বলেই মনে করতেন।

> গণিত-দর্শন প্রসঙ্গে গাণিতিক *বিবৃতি* বিষয়ে ভিটগেনষ্টাইনের বক্তব্য নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। ভিটগেনষ্টাইন বলতে চেয়েছেন, গাণিতিক বিবৃতিগুলি দৈনন্দিন জীবনের বা বিজ্ঞানের বিবৃতির তুলনায় ভিন্ন চরিত্রের, কারণ সেগুলি কোন 'নির্দিষ্ট কিছু' সম্পর্কে তথ্য দেয় না - বস্তুত, সেগুলিকে এক একটি 'নিয়ম' বলা যেতে পারে। তাঁর এই বক্তব্য, প্লেটো-বাদী দর্শনের সমালোচনার একটি অংশ - কারণ প্লেটো-বাদ গাণিতিক বিবৃতিগুলিকে দেখে এক গাণিতিক 'বাস্তবতার' এক একটি বর্ণনা রূপে (সূত্র [St] দ্রষ্টব্য)।

বাস্তবতাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অসংখ্য ছোটছোট, টুকরোটুকরো মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য । এই যে নানা দিক থেকে নানা ভাবে গণিতকে দেখা, কোন একটিমাত্র মতবাদের নিরীখে গণিতের অনন্ত বৈচিত্র্যকে বিচার না করা, এর মূল্য অপরিসীম । ভিটগেনষ্টাইন যখন গাণিতিক বাস্তবতাবাদের ভ্রান্তির কথা বলেন তখন তিনি কিন্তু অপর কোন একতন্ত্রী দার্শনিক অবস্থান থেকে তা বলেন না, তাঁর বক্তব্যের ভিতর থাকে নানান দর্শনের এক ইতিবাচক মিশ্রণ (দর্শনে 'বহুত্ববাদ'কে সাধারণত সমালোচনার চোখে দেখা হয়, কিন্তু 'বহুত্ববাদ' কথাটি আপেক্ষিক)। বস্তুত, দর্শন অনেকসময়ই *মতাদর্শের* রূপ নিয়ে আমাদের ভাবনাকে গ্রাস করে, এবং প্রয়োজন হয় দর্শন নয়, দর্শনের ভ্রান্ত দিশা থেকে মুক্তি।

> তবু কিন্তু দর্শনের প্রয়োজন ফুরোয় না, কারণ যে কোন বিষয়কে অন্য নানান বিষয়ের সঙ্গে এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখাই দর্শন।

প্রকার-তত্ত্বের অন্যতম স্রষ্টা গাণিতিক ম্যাকলেন তাঁর আত্মজীবনীতে ভিটগেনষ্টাইন এবং অন্যান্য দার্শনিকদের গণিত-দর্শনকে অনেকটাই উপেক্ষার চোখে দেখেছেন: "আমার মনে হয়েছে যে গণিতের ভিতর সত্যিই কি আছে না আছে সেটা ঠিকমত তুলে ধরা উচিৎ , আর গণিতের অন্তর্বস্তু ঠিকমত জেনে তবেই স্থির করা উচিৎ গণিতের দর্শনকে ঠিক কী ভাবে গড়ে তুলতে হবে, ভিটগেনষ্টাইনের মত দার্শনিকেরা যা জানতেন না" ([Mac], অধ্যায় 59)। ম্যাকলেন নিজে গণিতের দর্শন বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন, তবু অন্য অনেক গাণিতিকদের মতই দার্শনিকদের গণিতে জ্ঞান সম্পর্কে তিনিও ছিলেন একটু সংশয়ী এবং উন্নাসিক। এ কথা ঠিক যে গণিত সম্পর্কে কিছুটা ধারণা ও জ্ঞান ছাড়া গণিত -দর্শনে মৌলিক কিছু বলা সহজ নয়, তবে এই 'কিছুটা'র অর্থ যে ঠিক কতটা তার কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই। গণিত-চর্চা আর গণিত-দর্শন এক নয়। আর, সব চাইতে বড় কথা, ম্যাকলেন ভিটগেনষ্টাইনকে ঠিক সেই অভিযোগেই অভিযুক্ত করেছেন, ভিটগেনষ্টাইন নিজে যার বিরুদ্ধে ক্রমাগত সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেছেন - বস্তুত, গণিত-দর্শন বলতে সাধারণত যা বোঝানো হয় তিনি ছিলেন তার বিরোধী, যে কারণে তাঁর গণিত-ভাবনাকে অনেক সময় 'দর্শন-বিরোধী' আখ্যা দেওয়া হয়। আমার একটা কথা মনে হয়েছে (বিশেষজ্ঞরা কি বলবেন, জানি না): গণিতের 'ভিতরের

লোক' হিসেবে প্রকার-তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে ম্যাকলেন ও অন্যান্য গাণিতিকেরা গণিত সম্পর্কে যে ধারণাটি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, গণিতকে 'বাইরে' থেকে দেখা সত্ত্বেও ভিটগেনষ্টাইনের ভাবনার অভিমুখ ছিল অনেকটা সে দিকেই (সূত্র [Kr] দ্রষ্টব্য)।

> যেমন, প্রকার-তত্ত্বে গাণিতিক 'বস্তু' বা প্রকারতন্ত্রের অন্তর্গত কোন সদস্যের পরিচয় নির্ধারিত হয় সেটির সঙ্গে অন্য নানান বস্তুর (এমনকি, সেটির নিজেরও) নানাবিধ সম্পর্কের ভিতর দিয়ে। একইভাবে, ভাষা-তত্ত্বে ভিটগেনষ্টানের সুপরিচিত বক্তব্য হল, কোন পদের শব্দার্থ নির্ধারিত হয় ভাষায় সেটির প্রয়োগ দিয়ে (সূত্র [AMS], পৃঃ 405 দ্রষ্টব্য), অর্থাৎ কোন প্রসঙ্গে অন্য কোন কোন পদের সাহচর্যে সেটি প্রযুক্ত হচ্ছে, তা দিয়ে। গাণিতিক ধারণাগুলি সম্পর্কেও তাঁর ভাবনার অভিমুখটি ছিল এ রকমই।

ভিটগেনষ্টাইনের গণিত-ভাবনার বিপুল বিস্তৃতি ও তার অসংখ্য দিক সম্পর্কে এক শতাংশ ধারণাও আমার নেই (গণিত বিষয়ে তাঁর অনেক বক্তব্য সমালোচিতও হয়েছে) - তবু গণিতের দর্শন বিষয়ে তাঁর চিন্তার এই একটিমাত্র দিকের অল্প আভাস দিয়েই আমি শেষ করতে চেয়েছি অতি নগণ্য এই নিবন্ধ। এর পর বাকি রইল তৃতীয় পর্বের সারসংক্ষেপ।

গণিত-দর্শন - তৃতীয় পর্ব - সারসংক্ষেপ ।।

এই তৃতীয় পর্বের বক্তব্যের কিছুটা, দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা ও সারসংক্ষেপের একটি অংশের বিশদতর ব্যাখ্যা। গণিত কোন অনৈসর্গিক জগতের ব্যাপার নয়, গণিতের অবস্থান মানুষের বোধ-বৃত্তি ও মনন-ক্ষমতার বিপুল প্রশস্ত ক্ষেত্রে । গাণিতিক সত্য ও গাণিতিক বিবৃতির তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য হয় কোন অতিলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি সহযোগে নয়, আমাদের অনুমান-ক্ষমতা ও হেতু-মনন সহযোগে, যা এক দীর্ঘ ও বিসর্পিল প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি-মননের ক্ষেত্র থেকে উন্নীত হয় সর্বজনীন ধারণার জগতে। গাণিতিক প্রমাণ, এক অর্থে, এক যান্ত্রিক ব্যাপার, এবং এই অর্থেই গণিত স্বতঃপ্রতীত, কিন্ত গাণিতিক ধারণাগুলিতে আমরা পৌঁছই অনুমান-ক্ষমতা সহযোগে, যার অন্যতম অবলম্বন হল ব্যাপ্তি-অনুমান। যৌক্তিক প্রমাণের বিপরীতে, ব্যাপ্তি-অনুমানের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই, তবু এক দিকে নিশ্ছিদ্র প্রমাণ আর অপর দিকে ব্যাপ্তি-অনুমান কাজে লাগিয়েই মানুষ গড়ে তুলেছে গণিতের জগৎকে, যার অবস্থান বস্তুত আমাদের ধারণার জগতের ভিতরই। গণিতের শুরু সুদূর অতীতে, সেই সময়কার বাস্তব সমস্যাবলীর প্রয়োজন মেটাতে, যেখানে গণিত আর বিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য ছিল না, দুইই ছিল বাস্তব সদর্থক অভিজ্ঞতার সারসংকলন, কিন্তু ক্রমশ দেখা দিল বিভাজন - প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়োজিত হল প্রাকৃতিক জগতের নানান ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে,

আর গণিত হয়ে উঠতে থাকল এক স্বতন্ত্র জগতের ব্যাপার - যেখানে প্রাধান্য পেল স্বীকৃতি ও যৌক্তিক নীতি, যেখানে সত্যতা ও যাথার্থ্যের যাচাই হতে থাকল প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নিরীখে নয়, গাণিতিক কষ্টিপাথরে - মানুষ নতুন গাণিতিক সত্যের সন্ধান করল ব্যাপ্তি-অনুমান ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে। গণিত বিবর্তিত হতে থাকল নানান অভ্যন্তরীণ চাহিদার তাগিদে, এক অদৃশ্য অথচ ব্যাপক ও অমোঘ অনুশাসনের নজরদারীতে, যেখানে অনুমান, স্বীকৃতি, বা যৌক্তিক নীতির চয়ন ও প্রয়োগ যথেচ্ছ নয়। ফলত, গণিতের প্রশস্ত কাঠামোটির ভিতর গণিত-চর্চার একাধিক ধারা থাকলেও, এবং তাদের অন্তরালবর্তী দর্শন ভিন্ন হলেও, সেগুলির পদ্ধতি ও লক্ষ্যের ভিতর থাকে প্রগাঢ় সাযুজ্য।

গাণিতিক প্রমাণ নিশ্ছিদ্র ও অমোঘ, এ কথাও যেমন সত্য, তেমনই আবার এ কথাও সত্য যে গণিত-চর্চার দুই ভিন্ন ক্ষেত্রে স্বীকৃতিগুলি কিছুটা ভিন্ন হতে পারে, যৌক্তিক নিয়মতন্ত্রে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। শেষ বিচারে কোন নিয়মতন্ত্রই শতকরা একশ ভাগ সুনির্দিষ্ট নয়, কারণ নিয়মতন্ত্র সর্বদাই বহু-স্তরবিশিষ্ট হয়ে থাকে, যেগুলির ভিতর থেকে যায় অকথিত কিছু অংশ, যার নিম্নতম স্তরে থাকে কিছু দৃষ্টান্ত-ভিত্তিক নির্দেশ। স্বীকৃতি ও যৌক্তিক নিয়মতন্ত্রের বিবর্তনের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, এবং সেই ইতিহাসের পথেই আবির্ভূত হয় গণিত-চর্চার একাধিক ভিন্ন ধারা।

আর, এই ভিন্নতাই আমাদের বলে দেয়, প্লেটোবাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন অবশ্যগ্রাহ্য সর্বজনীনতা নেই, কারণ গণিত যদি কোন সুদূর জগতের স্বতঃনির্ধারিত (বা পূর্ব-নির্ধারিত) সত্যের সমাহার হত, তা হলে গণিতের ভিতর ভিন্নতার কোন জায়গাই থাকত না। অবশ্য এই ধরনের 'যুক্তি' দিয়ে কোন দৃষ্টিভঙ্গীকে খন্ডন করা যায় না, এবং, বস্তুত, নানান ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্ব সর্বদাই প্রাণশক্তির সহায়ক। তাই, বোধবাদী দর্শনের যেমন সদর্থক দিক রয়েছে যা আমাদের বলে দেয় যে গণিতের অবস্থান আমাদের ধারণার জগতে, গাণিতিক সত্যের নাগাল আমরা পাই আমাদের বোধবৃত্তি ও মনন-ক্ষমতার সাহায্যে, তেমনই আবার প্লেটোবাদেরও সদর্থক দিক থাকা স্বাভাবিক - বস্তুত, গোয়েডেল-বর্ণিত অন্তর্দৃষ্টির স্বভাব-বাদী ব্যখ্যা গণিতে-দর্শনে খুবই ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারে, এবং চিরায়ত গণিতে গাণিতিক সত্যতা আর যাথার্থ্যের ভিতর যে ব্যবধানের কথা বলা হয় (বোধ-বাদী দর্শন যা স্বীকার করে না) তা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যতা ও যাথার্থ্যের ভিতরকার ব্যবধানের সঙ্গে তুলনীয় একটি উপযোগী ধারণাও হতে পারে।

বস্তুত, গাণিতিক সত্যতার নাগাল আমরা পাই ব্যাপ্তি-অনুমানের পথ ধরে, যার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই, আর তাই সে সত্যতা অনিবার্য নয় - ব্যাপ্তি-অনুমান অনেক সময়ই পথভ্রষ্ট হয়, আর বহু-সংখ্যক ভ্রান্ত অনুমানের ভিতর থেকে যায় সত্যের এক একটি হীরকখন্ড। কিন্তু সত্যতার অভিজ্ঞান হল তার যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা, যা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সত্যতা আর যাথার্থ্যের ভিতরকার ব্যবধান দর্শন ও মানব-অস্তিত্বের এক গভীর ও অমীমাংসিত (সম্ভবত *অমীমাংসেয়*) প্রশ্ন - বোধবাদ যখন এই ব্যবধান অস্বীকার করে তখন সে তার নির্দিষ্ট গন্ডীর ভিতর তা করতেই পারে, কিন্তু প্রশ্নটি তাতে বাতিল হয়ে যায় না।

ব্যাপ্তি-অনুমান সংঘটিত হয় অনেকটাই আমাদের অগোচরে , অচেতন মনের ক্রিয়ায়, যা সম্ভব হয় বিবর্তনের পথে উদ্ভূত অনুমান-ক্ষমতা সহযোগে। এটিই সম্ভবত গোয়েডেল-বর্ণিত অন্তর্দৃষ্টির স্বভাব-বাদী ব্যখ্যার এক অন্যতম সূত্র। ব্যাপ্তি-অনুমানে আমাদের সহায়ক হয় বহুবিধ *হ্রস্ব-বোধ* । গাণিতিক জর্জ পোলিয়া গণিত-চর্চায় ব্যাপ্তি-অনুমানের এবং নানাবিধ গাণিতিক হ্রস্ব-বোধের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন। ব্যাপ্তি -অনুমান এবং হেতু-মননের ক্ষেত্র হল আমাদের ধারণার জগৎ, যাকে একটি গাণিতিক মন্ডলের অনুরূপ তন্ত্র বলে ভাবা যায়। এই বিস্তৃত ও জটিল মন্ডলের ভিতর চলে অসংখ্য ধারণার অতি জটিল বিবর্তন- এরই ভিতর অবস্থিত গাণিতিক ধারণার জগৎ । ধারণাগুলি বস্তুত এক একটি *সম্পর্কের* দ্যোতক। প্রাকৃতিক জগতের অভ্যন্তরীণ নানান জটিল সম্পর্কের সূত্র ধরে গড়ে ওঠে নানান ধারণা, আবার এইসব ধারণার ভিতরও স্থাপিত হয় নানান সম্পর্ক- অসংখ্য বিচিত্র সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে অভিনব ধারণাপুঞ্জ। ধারণা-মন্ডলে অভিনব ধারণার আবির্ভাব হয় কী ভাবে, মনস্তত্ত্বে ও কৃত্রিম-মনন বিজ্ঞানে তা অনেকটাই অজানা, কিন্তু তা সম্ভবত পুরোপুরি অজ্ঞেয় নয়- এই জানার তাগিদ দর্শনকে যুগিয়ে দেয় স্বভাব-বাদ।

স্বভাববাদের দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে কেউ কেউ গণিতের সঙ্গে বিজ্ঞানের অচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা বলেছেন। গণিতের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বোঝা সহজসাধ্য নয়- এ প্রসঙ্গে কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়ে গেছে। বিশেষত , গণিতের জগৎটি বিজ্ঞান-অনুসন্ধানের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও গণিত কিভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এত উপযোগী ও কার্যকর, সেটি এক মৌলিক প্রশ্ন। তবে গণিত ও বিজ্ঞান পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র হলেও, উভয়েরই অবস্থান কিন্তু আমাদের ধারণার জগতে। সেখানে বিজ্ঞানের কাজ হল প্রাকৃতিক জগৎ থেকে পাওয়া সাক্ষ্য -প্রমাণের কষ্টিপাথরে আমাদের ধারণাগুলিকে যাচাই করা, আর গণিতের কাজ হল প্রাকৃতিক জগতের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলি এবং আমাদের ধারণার জগতের সম্পর্কগুলিকে এক স্বতন্ত্র নিরীখে দেখা, ও তা থেকে ক্রমশ নতুন নতুন সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা তৈরী করা, যেগুলি মেনে চলবে গণিতের অমোঘ অনুশাসন। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার জন্য তৈরী করে সে জগতের এক একটি প্রতিরূপ, যেগুলি আবার ক্ষেত্রবিশেষে কোন এক প্রস্থ গাণিতিক সত্যতারও বাহক হতে পারে (স্মরণ করা যেতে পারে, কোন একগুচ্ছ গাণিতিক বিবৃতির সত্যতা নির্ধারিত হয় এক বা একাধিক সমাহারের সাপেক্ষে, যেগুলি ওই সব বিবৃতির ক্ষেত্রে গাণিতিক প্রতিরূপের কাজ করে)।

বিশ্বজগতের অভ্যন্তরীণ বহুবিধ বিচিত্র সম্পর্কের ভিতর বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ হল *সাদৃশ্যের* সম্পর্ক। পোলিয়া গাণিতিক চিন্তায় সাদৃশ্য-সন্ধানের উপর জোর দিয়েছিলেন। বস্তুত, সাদৃশ্য সন্ধানের মাধ্যমেই আমাদের ধারনার জগতে নানাবিধ বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। সম্পর্ক ও সাদৃশ্য, এই দুইই হল ধারণার বিচিত্র-জটিল বিবর্তনের দুই প্রধান উপাদান। আর, এই দুই উপাদানকেই প্রধান উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে গাণিতিক *প্রকার-তত্ত্ব* । প্রকার-তত্ত্ব গণিতকে দিয়েছে এক নতুন অবয়ব - এক বিপুল প্রশস্ততা, যা গণিতের বহুবিধ স্থাপত্যকে গ্রথিত করেছে এক বিস্তৃত সম্পর্কের জালকে। প্রকার-তত্ত্বে গণিতের 'ভিত্তি' কথাটির তাৎপর্য বদলে গিয়েছে অনেকটাই- সমাহার তত্ত্ব যেমন সমাহার-গুলিকেই গণিতের 'মৌলিক' উপাদান রূপে চিহ্নিত করে, প্রকার-তত্ত্ব তা করে না - সব রকম গাণিতিক স্থাপত্যকেই এক আসনে বসায় প্রকার-তত্ত্ব- সব রকম স্থাপত্য সহযোগেই গঠিত হতে পারে প্রকার-তন্ত্র । আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিক বীজগণিতীয় জ্যামিতিতে (এবং, বস্তুত, গণিতের এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে) সুদূরপ্রসারী

পরিবর্তন এনেছিলেন প্রকার-তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়ে। প্রকার-তত্ত্ব, এক অর্থে, আমাদের ধারণার জগতের নানা বিচিত্র সম্পর্কেরই গাণিতিক প্রতিফলন।

প্রকার-তত্ত্বের অন্যতম স্রষ্টা ম্যাকলেন তাঁর আত্মজীবনীতে ভিটগেনষ্টাইন ও অন্যান্য দার্শনিকদের গাণিতিক জ্ঞানের অপ্রতুলতার কথা বলেছেন, এবং আরো বলেছেন, সম্যক গাণিতিক জ্ঞানের অভাবে এঁদের গণিত-দর্শন সার্থকতা খুঁজে পাবে না । গণিত-দর্শনে কতটুকু গাণিতিক জ্ঞান প্রয়োজন তা অনেকটাই নির্ভর করে গণিত -দর্শন বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, তার উপর। ম্যাকলেন ভিটগেনষ্টাইনকে গণিতের অন্যান্য দার্শনিকদের সঙ্গে একাসনে বসালেও, ভিটগেনষ্টাইন কিন্তু গণিত দর্শনকে দেখতেন অন্যান্য অনেক দার্শনিকের তুলনায় ভিন্ন দৃষ্টিতে , যার সঙ্গে স্বভাব-বাদের অনেকটাই সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। তাঁর (ভিটগেনষ্টাইনের) গণিত-জ্ঞান যথেষ্ট ছিল কি না সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা চলে, তিনি গণিত-দর্শন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ভাঙতেই চেয়েছিলেন - কোন এক সার্বিক গণিত-দর্শনের বিপরীতে তিনি গণিতকে দেখতে চেয়েছিলেন নানা দিক থেকে নানা ভাবে, এবং এই সব টুকরো টুকরো পর্যবেক্ষণ সহযোগে তিনি চেয়েছিলেন গণিত-দর্শনের কিছু ভ্রান্ত দিশা থেকে মুক্তি। আধুনিক গণিতের অন্যতম নায়ক ম্যাকলেনও নিশ্চই তাইই চেয়েছিলেন - দু জনের ভিতর একজন ছিলেন গণিতের ‘ভিতরের’ লোক, আর অপরজন ‘বাইরের’।

সূত্র-তালিকা

[AMS] Michael Artin, Allyn Jackson, David Mumford, and John Tate (Coordinating Editors), “Alexandre Grothendieck 1928-2014, Part 2”, *Notices of the AMS, 63:4,* 401-413 (2016).

[Aw] Steve Awodey, “An answer to Hellman's question: ‘Does category theory provide a framework for mathematical structuralism?’ ”,*Philosophia Mathematica 12:1,* 54-64 (2004).

[BCT] Jerome H. Barkow, Leda Cosmides, and John Tooby (ed.s), *THE ADAPTED MIND: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture*, Oxford University Press, Oxford (1992).

[BP] R. Brown and T. Porter, "Category Theory: an abstract setting for analogy and comparison", in *What is Category Theory? Advanced Studies in Mathematics and Logic*, 257-274, Polimetrica Publisher, Italy (2006), available at URL: https://groupoids.org.uk/pdffiles/Analogy-and-Comparison.pdf [last visited: 16 October, 2018].

[Bi] Errett Bishop, "Schizophrenia in Contemporary Mathematics" (1973), available at URL: https://prl.ccs.neu.edu/img/sicm.pdf [last visited: 6 October, 2018].

[Bo] Margaret A. Boden, *The Creative Mind: Myths and Mechanisms*, Routledge, London (2004)

[Co] Mark Colyvan, *An Introduction to the Philosophy of Mathematics*, Cambridge University press, Cambridge (2012).

[GV] Alexander George and Daniel J. Velleman, *Philosophies of Mathematics*, Blackwell Publishers, Oxford (2002).

[Ga] Peter Gärdenfors, *Conceptual Spaces: The geometry of Thought*, The MIT Press, Cambridge (2000).

[IEP1] Maarten McKubre-Jordens, "Constructive Mathematics" in *Internet Encyclopedia of Philosophy,* ISSN 2161-0002, available at URL: https://www.iep.utm.edu/con-math/#H4 [last visited: 6 October, 2018].

[IEP2] Sorin Bangu, "Ludwig Wittgenstein: Later Philosophy of Mathematics" in *Internet* Encyclopedia of Philosophy, ISSN 2161-0002, available at URL: https://www.iep.utm.edu/wittmath/ [last visited: 16 October, 2018].

[Ki John F. Kihlstrom, 'The Cognitive Unconscious', *Science*, 237:1445-1452 (1987).

[Kit] Philip Kitcher, "Mathematical Naturalism", in William Aspray and Philip Kitcher (ed.s), *History and Philosophy of Modern Mathematics*, University of Minnesota Press, Minneapolis (1988).

[Kr] Ralf Krömer, *Tool and Object: A History and Philosophy of Category Theory*, Birkhäuser, Basel (2007).

[La] James Ladyman, *Understanding Philosophy of Science*, Routledge, London (2002).

[Law] William Lawvere, "Unity and Identity of Opposites in Calculus and Physics", *Proceedings of ECCT 1994 Tours Conference*, *Applied Categorical Structures, 4*, 167-174, Kluwer Academic Publishers, (1996).

[Le] Christopher C. Leary, *A Friendly Introduction to Mathematical Logic*, Prentice-Hall Inc., New Jersey (2000).

[Lei] Tom Lenister, *Basic category Theory,* Cambridge University Press, Cambridge (2014).

[Ma1] Penelope Maddy, *Naturalism in Mathematics,* Clarendon Press, Oxford (1997).

[Ma2] Penelope Maddy, *Second Philosophy: A naturalistic method,* Oxford University Press, Oxford (2007).

[Mac] Saunders Mac Lane, *A Mathematical Autobiography*, A.K. Peters Ltd., Wellesley (2005).

[Po] G. Polya, *Mathematics and Plausible Reasoning*, vol. 1, *Induction and Analogy in Mathematics,* Princeton University Press, Princeton (1954); vol. 2, *Patterns of Plausible Inference,* Princeton University Press, Princeton (1968).

[Ru] David Ruelle, "Is Our Mathematics Natural? The Case of equilibrium Statistical Mechanics", *Bulletin (new series) of the American Mathematical Society, 19:1*, 259-268 (1988).

[SEP] Alexander Paseau, "Naturalism in the Philosophy of Mathematics", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*(Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta(ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/naturalism-mathematics/>.

[Sh] Stewart Shapiro, *Thinking about mathematics: The Philosophy of mathematics*, Oxford University Press, Oxford (2000).

[Sm] Jan M. Smith, "Evolution and Logic", in Peter Dybjer, Sten Lindström, Erik Palmgren, Göran Sundholm (ed.s), *Epistemology versus Ontology*, *Essays on the Philosophy and Foundations of Mathematics in Honour of Per Martin-Löf*, Springer, Dordrecht (2012).

[St] Sören Stenlund, "The "Middle Wittgenstein" and Modern Mathematics", in Peter Dybjer, Sten Lindström, Erik Palmgren, Göran Sundholm (ed.s), *Epistemology versus Ontology*, *Essays on the Philosophy and Foundations of Mathematics in Honour of Per Martin-Löf*, Springer, Dordrecht (2012).

[To] Michael Tomasello, *A Natural History of Human Thinking*, Harvard University press, Cambridge (2014).